জুলাই-আগস্ট 1999
সেপ্টেম্বর

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

একবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা | দাম সাড়ে সাত টাকা

আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি
স্কোলিওসিস
মোটর গাড়ীর দূষণ ও ইউরোবিধি
পরিবেশ আইন ও নাগরিক কর্তব্য
নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন
এই রাজ্যে চিকিৎসা-ব্যবসা

□□■□

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 21 সংখ্যা 3 ☐ জুলাই-আগস্ট 1999 সেপ্টেম্বর

সূ চি প ত্র

আমাদের কথা ... 1

কষ্ট ক্রোধ ও আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি ... 2

স্কোলিওসিস-মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া রোগ ... 9

মোটর গাড়ীর দূষণ ও ইউরোবিধি ... 11

বিষয় : পরিবেশ
পরিবেশ আইনকানুন
নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য ... 20

নর্মদা আন্দোলন পরিচিতি ... 25

পরিক্রমা :
চিকিৎসা ব্যবসা এই রাজ্যে ... 28
কার্গিল ও দেশপ্রেম ... 29
ফালুন গং ও চীন সরকার ... 30

পুস্তক পরিচিতি ... 32

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252, লেকটাউন, ব্লক A
কলকাতা 700 089

আমাদের কথা

গত বছর দেখেছি পোখরান বিস্ফোরণ। এবার অন্য। কাশ্মীর সীমান্ত সংঘর্ষ। লক্ষ্য অনুপ্রবেশকারী দখলদারদের হঠানো। যুদ্ধ নয়। সরকারী ভাষ্যে 'যুদ্ধের ন্যায় পরিস্থিতি'। কোড নেম 'অপারেশন বিজয়'। লোকমুখে 'কার্গিল যুদ্ধ'। পটভূমি হিসেবে বিদ্যমান সাধারণ নির্বাচন। যেটা হওয়ার কথা ছিল না। তবু হচ্ছে। নিছক কিছু ব্যক্তি স্বার্থে। ভোট মানেই লুঠের অধিকার কার হাতে থাকবে তার লড়াই। এদিকে কার্গিলের পর জনগণ দেশপ্রেমে বিগলিত। সামনে ভোট। এবার তৎপর হওয়ার পালা।

এরই ফাঁকে ঘটে যাচ্ছে বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মিডিয়ায় তাদের ঠাঁই জুটলেও জনগণের মনের নাগাল পাচ্ছে বলে মনে হয় না। বহুজাতিক কোম্পানীর কাছে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশ। দিচ্ছে 'দেশপ্রেমিক' নেতারা। যারা সব দলেই আছে। অবাধ বিশ্ববাণিজ্যের নামে অবাধ লুণ্ঠনের হাজারো ফিকির তৈরী হচ্ছে প্রতিদিন। আর এই লুণ্ঠন তদারকির জন্য তৈরী হয়েছে *WTO*। দেশনেতারা উদ্বাহু এই ব্যাপারেও। 'দেশ-অন্ত' প্রাণ নেতারা এর পরেও জোর গলায় ভোট চাইছে। এবং পাচ্ছেও। অন্যদিকে এরই মধ্যে সল্‌তের মত কিছু কিছু প্রতিবাদ জিইয়ে রেখেছে যারা তারা আর বিশেষ জায়গা পাচ্ছে না ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বা খবরের কাগজের পাতায়। মানুষের মনে তো নয়ই। তবুও নর্মদার সর্দার সরোবর বাঁধের জলে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া নিমজ্জমান গ্রামের মানুষদের সাথে কিছু মানুষ যে সহমর্মীতা দেখানোর জন্য জড়ো হয়েছিল সেটা এক বিরাট আশ্বাসের কথা। ইতিমধ্যে ভারত সরকার নিউক্লিয়ার পলিসি নিয়ে এক ডকুমেন্ট প্রকাশ করে দেশ বিদেশের বাজার গরম করে তুলেছে। পোখরানের খেটোলাইয়ের মানুষ কিন্তু পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে তাদের পদযাত্রা কর্মসূচীতে অনড় থেকেছেন। এটাও আশার কথা।

চলমান এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দেশপ্রেম- অপ্রেমের আসল সত্য। তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেই চারদিকে এত সোরগোল জিগির। কারো মুখে জাতপাত। কারো মুখে কোরাপশন। কারো বা কমিউনালিজম। জনগণ অপেক্ষমান।

এই সোরগোলের মধ্যেই বিওবি'র এই সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহক-পাঠকদের কাছে আবেদন, আপনাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন। আর আবেদন - - আপনিও লিখুন। আপনার ভাবনার কথা, আপনার ভাল-লাগা মন্দ লাগা, নিন্দা সমালোচনা প্রস্তাব অন্তত চিঠি লিখে জানিয়ে উত্যক্ত করুন। অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্যই পত্রিকা।

কষ্ট ক্রোধ ও আমূলপরিবর্ত্তনকামী রাজনীতি

রজার এস. গটলিয়েব

রজার এস. গট্‌লিয়েবের (Roger S. Gotlieb) একটি বইয়ের শেষ অধ্যায়ের ("মার্কসবাদ ও আত্মিকতা") দ্বিতীয়াংশের অনুবাদ নীচে উপস্থিত করা হল। প্রথমাংশের অনুবাদ ("আমূল পরিবর্তনকামী রাজনীতি ও অহং") গতসংখ্যার (এপ্রিল-জুন, 1999) বি-ও-বি তে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ও রচনা সংক্রান্ত কিছু দরকারী তথ্য এবং বিশেষ কিছু প্রতিশব্দের জন্য ঐ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সামাজিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ বা উৎসাহী পাঠকদের উদ্দেশ্য করেই এই রচনা গট্‌লিয়েব তৈরী করেছেন। কাজেই অন্য ধরণের পাঠকের কাছে এখানে আলোচিত নানা সমস্যা কতটা প্রাসঙ্গিক মনে হবে সেটা বলা মুশকিল।

রচনায় উপস্থাপিত সামাজিক আবহ ও উদাহরণ প্রধানতঃ পশ্চিমী দুনিয়া থেকে আহরিত। তার মধ্যে আবার ইহুদী দুনিয়ার কথা বিশেষ ভাবে এসেছে। এরও সহজ কারণ এই যে গট্‌লিয়েব পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষ এবং জাতিগোষ্ঠীর দিক থেকে ইহুদী। কিন্তু, আমাদের কাছে ভিন্‌দেশী, এই বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তার আবেদন সার্বিক। এমনকি আমাদের কারো কারো কিছু কিছু উপলব্ধির সাথেও তা মিলতে পারে। অন্য দিকে, তুলনীয় দেশজ অভিজ্ঞতা । উদাহরণও সহজলভ্য। কাজে কাজেই এই অনুবাদ। বিতর্কের অবকাশ তো অবশ্যই আছে। তেমন কিছু হ'লে খুবই ভাল।

আমূল পরিবর্ত্তনকামী রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য নিপীড়িতদের কিভাবে একত্রিত করা হয়? বামপন্থী নানা রাজনৈতিক তত্ত্বে একথা ধরেই নেওয়া হয় যে কোন না কোন চেহারায় রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই নিপীড়নজনিত কষ্ট ও যন্ত্রণা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠতে পারে। আশা করা হয় যে এই সচেতনতা থেকেই নিপীড়নের প্রতি ন্যায়সংগত ক্রোধ ও রাজনৈতিক চেতনার জন্ম হবে, যা আবার গোষ্ঠী-বিদ্রোহ (নিপীড়িতদের)ও শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের স্বপক্ষে সক্রিয় পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে। পরিবর্ত্তনের যে প্রক্রিয়া তা এভাবেই কষ্ট থেকে ক্রোধ, আবার ক্রোধ থেকে বিদ্রোহ এই সূতোয় গাঁথা।

আরও নির্দ্দিষ্ট পরিভাষায় বলতে গেলে *মার্কসবাদী* তত্ত্ব দাবী করে যে শোষণ, বেকারী, উৎপাদনের সীমিতকরণ, শ্রমবিচ্ছিন্নতা এবং আপেক্ষিক দারিদ্র থেকে মজদুর-রা কষ্ট পান। এরকম কষ্ট পাওয়া, আত্মসচেতন বিপ্লবী হিসেবে মজদুরদের সংগঠিত করে তোলার পূর্বশর্ত। তাদের কষ্টের চরিত্র ও কারণ সম্পর্কে সচেতনতা যখন রাজনৈতিক কাজকর্মে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, যখন তার সাথে যুক্ত হয় মজদুর শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যুক্ত হয় উৎপাদনে তাদের অপরিহার্য ভূমিকা, তখনই আমরা পেয়ে যাই সমাজবিপ্লবের ভিত্তি।

মার্কসবাদী অনেক দৃষ্টিকোনকেই *নারীবাদ* (Feminism) আপন করে নিয়েছে। কিন্তু তারই সাথে নারীবাদ যেটা যোগ করেছে, তা হ'ল ব্যক্তিগত জীবনে রোজকার অভিজ্ঞতার ওপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া। মেয়েরা যখন তাঁদের নিজেদের বেদনাকে খোলাখুলি নিজেদের মধ্যে *ভাগ* করে নেন তখন তাঁরা দেখতে পান যে তাঁদের নিজ নিজ যে বিশেষ পরিস্থিতি তার মধ্য দিয়ে একটা সাধারণ নিপীড়নই প্রকাশ পাচ্ছে।

এভাবেই সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কষ্টেরও রাজনীতিকরণ (Politicization) ঘটে। তার ফলে আত্ম-ঘৃণা, বিষাদ, নেশাগ্রস্ততা এবং আত্ম-অবমাননার যে আভ্যন্তরীন অপ্রতিরোধ্য তাগিদ, সে সবেরই একটা রূপান্তর ঘটে,—রূপান্তর ঘটে পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে এমন এক ক্রোধে, যা মেয়েদের ক্ষমতাবোধসম্পন্ন (empowerment) করে তোলে। এই ধারণা অনুযায়ী, অতীত ও বর্ত্তমানের কষ্টের বিরুদ্ধে এই ক্রোধ গঠনমূলক কাজের ভিত্তি তো রচনা করেই, উপরন্তু সামাজিকভাবে অধীনস্থ ভূমিকা থেকে মেয়েদের মুক্তির ভিত্তিও এই ক্রোধ থেকেই তৈরী হয়। নারী-পুরুষের যৌন/ রোমান্টিক সম্পর্কের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্তরে যে নিপীড়ন রয়েছে, সেটা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মার্কসবাদ ও নারীবাদে ক্রোধের এই যে ব্যবহার, নতুন নতুন নানা ধরনের আন্দোলনেও তার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। যেমন, বর্ণবৈষম্যজাত সংগ্রাম, সমকামীত্বের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম, সমস্ত ধরণের জাতিভিত্তিক মুক্তি সংগ্রাম ইত্যাদি। এইসব আন্দোলন এমন ধরণের জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে যাদেরকে চিত্রিত করা হয় যেন তারা ঠিক মানুষ নয়। ফলে তাদের জমি কেড়ে নিয়ে, তাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করে, তাদের

শ্রম শোষণ করে, তাদের অপমান করে, তাদের বর্জন করে বা তাদের নানা দিক থেকে বেঁধে ফেলে, নিপীড়নকারীদের মনে হয় তারা ন্যায্য কাজই করছে। নারীবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই এসব ক্ষেত্রেও যে প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে তা হল বেদনার গোষ্ঠীগত চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা ও ক্রোধের সাথে তার জবাব দেওয়া। এই ধরণের প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত উদাহরণ ফ্রাঞ্জ ফ্যানন (1)-এর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। তিনি দাবী করেছিলেন যে, একমাত্র হিংসাই পারে উপনিবেশবাদের চাপে ভাঙাচোরা মানুষদের হারিয়ে যাওয়া আত্মপরিচয় বোধকে ফিরিয়ে দিতে।

তাত্ত্বিকভাবে কষ্ট ও ক্রোধের ওপর এই বিশেষ গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রেও নিপীড়িত নানা গোষ্ঠী তাঁদের কষ্ট সম্পর্কে ক্রোধ প্রকাশে সোচ্চার হচ্ছেন— সোচ্চার হচ্ছেন মিছিলে, মিটিং-এ, বই-এ ও ইস্তেহারে, তর্ক-বিতর্কে, চীৎকার-চেঁচামেচিতে ও সর্বোপরি মুখোমুখি সরাসরি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। অতীত বা বর্ত্তমানের লিঙ্গ বৈষম্যবাদের (Sexism) বিরুদ্ধে মেয়েদের ক্রোধের চেহারা দেখে বহু পুরুষ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। বারে বারেই আমূলপরিবর্ত্তনকামীরা সমাবেশ, মিছিল, সভা ইত্যাদির জন্য সমবেত হয়েছেন এবং ক্রোধে উদ্দীপ্ত অবস্থায় অ্যাড্রেনালিন-এর (Adreinalin)(2) বিপুল নিঃসরণ নিজেদের শরীরে অনুভব করেছেন। এই ক্রোধ সাদার বিরুদ্ধে কালোর, পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর, দুনিয়ার যত রেগান, রকফেলার আর বুশ্‌দের বিরুদ্ধে বাম শিবিরের, ভীতি উদ্রেককারী বিপুল অ-ইহুদি দুনিয়ার বিরুদ্ধে ইহুদিদের (ইহুদি নিধন যজ্ঞকে মনে রেখে)।

যদিও খুব ব্যাপকভাবেই এসব দেখা যাচ্ছে তবুও এমন কি হতে পারে যে আমূল পরিবর্ত্তনকামী হয়ে ওঠার (radicalization) প্রক্রিয়ার এই ধরণের যে আদর্শ, সেটা আসলে বিভিন্ন নিপীড়িত গোষ্ঠীর মঙ্গলকেই ব্যহত করে বা ব্যহত করে মানবমুক্তির যৌথ প্রকল্পকে?

.... কোন সন্দেহ নেই যে, নিষ্ক্রিয়তা, আত্মধিক্কার, বিচ্ছিন্নতা ও তরল পানীয়-র মধ্যে নিজেদের দুঃখবোধকে ডুবিয়ে দেবার চেয়ে, সমষ্টিগত যন্ত্রণা ও কষ্ট সম্পর্কে সচেতনতা ও সেই সচেতনতা-সঞ্জাত স্বাভাবিক ক্রোধ শ্রেয়তর। নিপীড়িত মানুষদের সম্পর্কে যেসব মিথ্যা কথা বলা হয়ে থাকে, তা বিশ্বাস করার চেয়ে এই ক্রোধ বরং অনেক বেশী কাম্য। নিপীড়নের যে ফলাফল—অর্থাৎ, রাজনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে তোলা,— তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ সবই এক অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

কিন্তু এই সবেরই নিজ নিজ সীমাবদ্ধতাও আছে এবং আমার বিশ্বাস, এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রায়ই কোন অনুসন্ধান চালান হয় না।

প্রথমতঃ শ্রমিকরা ক্রোধে ফেটে পড়বেন, মার্কসবাদীদের এই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে রমরমা সংবাদ ও দৃশ্য পরিবেশন, তরল পানীয় ও ওষুধের নেশা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় তদারকীতে পরিচালিত অর্থনীতি ও এক গণস্তরীয় সংস্কৃতি (Mass Culture) মজদুরদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি ঘটিয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিকে খানিকটা প্রশমিত করেছে। এমনকি তাদের যন্ত্রণা পর্যন্ত প্রচলিত ব্যবস্থার সাথেই তাদের বেঁধে রাখছে। কাজ ও সাংস্কৃতিক অবনমনের ফলে নিপীড়িতদের মোটামুটি ধরণের সফল আন্দোলনও একেবারে বিরল হয়ে আসছে। কিছুদিন হ'ল ভোগবাদী সমাজ (Consumer Society) তার শিকারদের ক্রেডিটকার্ড দিয়ে প্লাস্টিকের শেকলে বেঁধে ফেলেছে। তাছাড়া কষ্ট সম্পর্কে মানসিক সচেতনতা আপনা থেকেই যৌথ রাজনৈতিক বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই; যন্ত্রণাসম্পর্কিত এই সচেতনতা বরং আত্মধিক্কারের দিকেই আরও বেশী করে নিয়ে যায়। যেমন, আমার মনে হতে পারে যে "আমাদের সমাজে যে স্বাধীনতা রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছি বলেই আমাকে মজদুরের জীবন যাপন করতে হচ্ছে।" বা, যন্ত্রণা সচেতনতা, আরও খেলনা আরও মাদকাশক্তি, বা আরও টেলিভিশনের মাধ্যমে এক পলায়নী মনোবৃত্তিতে নিয়ে যায়। কিম্বা, নিজের ভেতরের যন্ত্রণাবোধ তাদের ওপরে ঘৃণা হিসেবে আরোপিত হয়, যাদেরকে আলাদা বলে মনে হয়।

সংক্ষেপে, জীবন যাত্রা চালান'র ক্ষেত্রে কষ্ট, বঞ্চনা ও অবিচারের প্রতিবিধানের জন্য ক্রুদ্ধ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লব করতে হবে, এই যে ছবি, গত সত্তর বছরে তার আর বিশেষ কোন মানে নেই। আর শিল্পোন্নত দেশগুলোতে তো প্রচলিত অর্থে "বিপ্লবের" ধারণা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।

অধিকতর আত্মগত বা আত্মমুখী ঝোঁক (subjectively oriented) থেকে জাত যে সব ছাঁচ রয়েছে— যেমন নারীবাদ বা নতুন নতুন ধরণের সামাজিক আন্দোলন —তারাও গুরুতর সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। ক্ষমতাহীনতার সাথে নিজেদের একান্ত ভাবে একাত্ম করে ফেলা থেকেই এইসব সমস্যার প্রথম সূত্রপাত। কেবলই কষ্ট ও যন্ত্রণার সাথে নিজেকে বাড়াবাড়ি রকম একাত্ম হতে দিলে চিরকেলে শিকার বনে থাকার মনোবৃত্তি

জন্মায়। আমরা নিজেদের কাছেই নিজেদের পরিচয় এমনভাবে গড়ে তুলি যেন আমরা সবসময়েই অবিচারের শিকার ঃ কখনও ভাগ্যের, কখনও দুনিয়ার, কখনও বা বড়ভাই কিম্বা গালিগালাজ প্রিয় বাবার অথবা ধনীদের বা উঁচুজাতের বা পুরুষের। যত বেশী বেশী করে আমরা কেবলই নিজেদের কষ্ট ও যন্ত্রণার সাথে এক করে নিজেদেরকে দেখবো এবং নিজেদের সত্ত্বার নিপীড়িত দিকটির সংস্পর্শে যাবো, ততই কি কি জিনিষ পাইনি, বা কি কি পাওয়ার জন্য চেষ্টার সুযোগ পাইনি, কি অভিজ্ঞতা হারিয়ে গেছে, কোন সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, বা কোন কোন সুযোগ অন্যেরা পেয়েছে, কিন্তু আমরা পাইনি,—কেবল এসব নিয়েই নিজেদের জীবন গড়া মনে হবে। এর থেকে প্রায়ই যা জন্মায়, তা যৌথ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, জন্মায় আত্মকরুণা ও এক ধরণের সদা খেপে থাকা মনোভাব, যা মার্কস থেকে পাওয়া জীবন চিত্রের (বিপ্লবের জীবন) চেয়ে বরং নীটসে (3) (Nietzsche) থেকে পাওয়া জীবন চিত্রকেই (তিক্ত ক্ষোভে ভরা জীবন) বেশী মনে করিয়ে দেয়।

কেবল এটুকুই নয়, কষ্ট বা যন্ত্রণাকে ভিত্তি করে যে গোষ্ঠী পরিচয় গড়ে ওঠে তারই সাথে যত বেশী বেশী করে আমাদের ব্যক্তি সত্ত্বাকে মিশিয়ে দেব, তত আমরা এক অবিচারে ভরা ইতিহাসের দ্বারা সম্মোহিত (mesmerized) হয়ে পড়তে পারি। উদাহরণ হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গ ও ইহুদি ইতিহাস থেকে সংকলিত কিছু দৃশ্যের কথা ভাবুন— এমন সব দৃশ্য যা তাদের ভয়ঙ্করত্ব, লজ্জা, হতাশা বা পঙ্গু করে দেওয়া আতঙ্ক দিয়ে আমাদের স্থির, নিশ্চল করে দেয়। ক্রীতদাস চালানকারী জাহাজগুলির কথা ভাবুন, ভাবুন সেইসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা, যেখানে লাখো লাখো মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন; ভাবুন তাদের নিদারুণ বিচ্ছিন্নতার কথা যখন বাদবাকী জগৎ কোনরকম মাথা না ঘামিয়ে শুধু চেয়ে থেকেছে। আরও ভাবুন যে আপনি যদি বাবা বা মা হন, তখন আপনার শিশুকে একথা বলার অর্থ কি দাঁড়ায় যে "এই হল কৃষ্ণাঙ্গ কিম্বা ইহুদি হয়ে জন্মানর উত্তরাধিকার। দুনিয়া তোমার পূর্ব পুরুষদের সাথে এমনি ব্যবহারই করেছিল।" একজন আট বছরের শিশুর কথা ভাবুন, যে এখন জানবে "এরা তোমাকে তোমার পরিবারকে, তোমার বন্ধুদের, তোমার গোটা গ্রামের মানুষকে হত্যা করতে পারে। তোমাকে শেকলে বেঁধে ফেলতে পারে। তোমার দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিতে পারে।"

উত্তরাধিকারের এই ধরণের বোধ থেকে ইতিবাচকভাবে কোন গোষ্ঠী পরিচয় অনুভব করা প্রায় চলেই না। কাজেই "বিপ্লব"- এর বদলে বরং ঝোঁক যায় পালিয়ে যাবার দিকে, আত্মঘৃণার দিকে বা নিজের ইহুদি আত্মপরিচয় অন্য পরিচয়ে লীন করে দেবার দিকে, কিম্বা কালো হলে আর এক আঙ্কল টম হয়ে ওঠার দিকে, যার চোখে সমস্ত ক্ষমতাই রয়েছে সাদাদের পক্ষে। গোষ্ঠী পরিচয়ের অর্থই যদি হয় যন্ত্রণা ও কষ্ট, তবে গোষ্ঠী পরিত্যাগ করো, অন্য গোষ্ঠীতে যোগ দাও, কিম্বা নিদেন পক্ষে পাশে সরে দাঁড়াও। যদি তা না পারো তবে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে এই ভয়ংকর অনুভূতি বহন করে চলতে হবে যে, তোমার তুমি হওয়াটাই কিরকম বিপজ্জনক।

বা এর বদলে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারো। এবং অবশ্যই রাজনৈতিক ভাবে এই ধরণের প্রতিক্রিয়াকেই কাম্য মনে করা হয়। অন্য বিকল্প বলতে যদি শুধু ভয় ও আত্মঘৃণাই বোঝায়, তবে এই ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক ভালো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের নিয়ে যে নরমেধ যজ্ঞ হয়েছিল, সে সম্পর্কে তাদের বলতে শেখান হয় "কখনও ভুলবে না, কখনও ক্ষমা করবে না।" কালোদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে এই বাণী, "জয়তু কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষমতা, কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রোধ, কৃষ্ণাঙ্গ দের অহমিকা।" " বোনেদের গোষ্ঠী ক্ষমতাবান ..... ক্রোধে জেগে ওঠো ..... জনতার হাতে সমস্ত ক্ষমতা যাক।" বলা হয়ে থাকে এই ক্রোধ আমাদের ক্ষমতাবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে জ্বলন্ত করে রাখার জ্বালানি স্বরূপ কাজ করবে এবং সেটা তা করেও।

কিন্তু সেটা *আর কি* করে?

সেটা আর যা করে তা হল এক ধরণের মারমুখী, ভাবনা-চিন্তাহীন, আমিই ঠিক-মার্কা (self righteous) ক্রোধ যা মনের মধ্যে একেবারে ঘাঁটি গেড়ে বসে ও স্রেফ এক অভ্যেসে পরিণত হয়, পরিণত হয় সবকিছুকেই পরিব্যপ্ত করা এমন এক মৌলিক দৃষ্ঠিভঙ্গীতে, দেখবার চোখকেই যা অনেকখানি গণ্ডীবদ্ধ করে দিতে পারে। কিছু না কিছুর শিকারে পরিণত হওয়াই যদি আমাদের একমাত্র বিধিলিপি হয়, তবে সবসময়েই নিপীড়ক ও নিপীড়িত এই ছকে ফেলেই আমার সমস্ত পরিস্থিতিকে বুঝতে চেষ্টা করবো। কোনও কোনও পরিস্থিতিতে এই ছক নিশ্চয়ই যথাযথ, কিন্তু সব পরিস্থিতিতে মোটেই নয়।

যেহেতু এই রাজনৈতিক চেতনা সম্পৃক্ত ক্রোধে, আমিই ঠিক,—এরকম একটা মনোভাবের দিকে ঝুঁকে পড়ার সত্যিকারের প্রবণতা থাকে, রাজনৈতিক জীবনের ওপর এর এক বিপর্যয়কারী প্রভাব পড়তে পারে। প্রথম কথা হ'ল, আমি যদি ঠিক হই তবে অন্য কেউ নিশ্চয়ই ভুল। এই কায়দায় ভাবনা, অনৈক্য ও

ঝগড়ার সাথে একটা যেন বাধ্যতামূলক আসক্তির দিকে ঠেলে দিতে থাকে। আমি আর আমার ক্রোধ যে অভিন্ন হয়ে উঠি, সেই অভিন্নতাটা অংশতঃ এই বোধও বটে যে আমি চিরকালই অবিচারের শিকার। কাজেই সমুচিত শাস্তি দেবার উপায় খুঁজে বার করার অবিরাম চেষ্টা থেকে নিজেকে নিরস্ত করতে পারবো না। একই রকম ভাবে, আমি যদি আমার তিক্ততাকে আঁকড়ে থাকি, আমি সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারি। যেন সমস্ত ধরণেরই পরিস্থিতিরই আড়াল থেকে অসম্মান, হিংস্রতা বা শোষণের ভয় উঁকি-ঝুঁকি মারছে। যত সেসব খুঁজবো, তত আমি কেবল সে সবই দেখতে পাবো—তা সেসব থাকুক আর নাই থাকুক। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার এই যে, আমার চেতনাকে এই ক্রোধ যত গ্রাস করবে, ততোই আমাকে যারা সত্যিই নিপীড়ন করছে, তাদের ছাড়িয়ে আরও বহুদূর পর্যন্ত তা বিস্তৃত হবে। আমার গোষ্ঠীর মধ্যেই যাদের আমি পছন্দ করিনা, বা যারা আমার সঙ্গে সহমত নয়, অথবা অন্য গোষ্ঠীর যে সব সদস্যরা আমার ভীতি উদ্রেক করে, আমায় পছন্দ করে না বা যারা—অন্ততঃ এখনকার মত— আমার চেয়ে একটু ভালো আছে, এরা সবাই-ই অতি সহজে আমার ক্রোধের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ফলটা এই হয় যে লোকেরা কেবলই দেখার চেষ্টা করে যে কারা সবচেয়ে নিপীড়িত, কাদের ক্রোধ সবচেয়ে ন্যায্য, যন্ত্রণা ও দুঃখের কষ্ঠি পাথরে কার "পরিচয় পত্র" সবচেয়ে খাঁটি, এই রকম আচরণ বামেদের মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়েছে। আর এটা যেখানে রয়েছে সেখানে সংহতি স্রেফ উবে যায়।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এত বিপুল সংখ্যক ইহুদিরা যে ইহুদি নিধন যজ্ঞে শুধু ভয়াবহতারই ওপর জোর দেন, তা-ই নয়, তারা এর একমেবাদ্বিতীয়ম চরিত্রের ওপরও জোর দিয়ে থাকেন, তার আংশিক কারণ সেই যন্ত্রণার সাথে নিজেকে পুরোপুরি এক করে দেখা ও তজ্জনিত বিপুল ক্রোধ। এই নিধন যজ্ঞকে কেন্দ্র করে ক্রোধ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী এবং তার প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে এই মানসিকতা আমাদেরকে অনেক সময় অন্যদের যন্ত্রণার প্রতি ঠিক সংবেদনশীল হয়ে উঠতে দেয়না। মধ্যপ্রাচ্যে যে অন্তহীন সংঘর্ষ চলছে (ইস্রায়েল ও বাস্তুহারা প্যালেস্তানীয়দের মধ্যে—অনুঃ), তার অন্ততঃ একটা বড় উপাদান সংবেদশীলতার এই অভাব। একই কারণে প্যালেস্তানীয়রাও নিজেদের দুর্দশার প্রতি অন্তহীন আসক্তি দেখিয়ে চলেছে। সেই হারিয়ে যাওয়া জলপাইকুঞ্জ, হাইফায় কখনও-ভোলার-নয় কুটীর —যেন অনাগত হাজার বছর ধরে এই হারান'টাই তাদের জীবনের একমাত্র বাস্তবতা হয়ে থাকবে।

ইস্রায়েলী প্যালেস্তানীয়দের বিরোধের আমি উল্লেখ করছি কারণ তার আঁচ ব্যক্তিগত ভাবে আমার ওপর এসে পড়ে; কিন্তু এই বিশ্লেষণ অন্য নানা বিরোধের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। নিজের কিম্বা নিজ গোষ্ঠীর যন্ত্রণার ইতিহাসের সাথে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা সদাক্রুদ্ধ ব্যক্তি, মীমাংসার জন্য আলোচনা বা আপোষের কাজে খুব সুবিধের নয়। অতীতের বাস্তবতা সবসময়েই বর্ত্তমান হয়ে বিরাজ করতে থাকে। দুঃখ এবং আক্রোশ সমস্ত দাবীকে চরম দাবী করে তোলে, প্রতিটি আশংকাকে করে তোলে নিদারুণ। যে কোনও ছাড় দেওয়াকে তখন তোমার নিহত ভাই ও বোনেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা মনে হয়। আবার উল্টোদিক থেকে, ন্যায্য ক্রোধে উদ্দীপিত, বঞ্চনা বা নিপীড়নের শিকার একদল মানুষ নিয়ে যদি তোমার গোষ্ঠীটি গঠিত হয়, তবে হিংস্রতা ও আধিপত্যের দিকে নিজেদের ঝোঁককে দেখতে পাওয়াটা কঠিন হয়ে ওঠে। সেইসব ঝোঁকের যখন আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখন তাকে অস্বীকার করতেই হবে, কারণ, অপাপবিদ্ধরা পীড়িত হচ্ছে এরকম একটা নির্ভেজাল ছবির সাথে সেই ধরণের আত্মপ্রকাশের একটা বিরোধ আছে।

নিপীড়নের শিকার হওয়া ও তজ্জনিত ক্রোধ দিয়েই যেসব গোষ্ঠী নিজেদের আত্মপরিচয় গড়ে তোলে, তারা পারস্পরিক সহযোগিতার কাজেও তেমন ভাল নয়। এতে কি আশ্চর্যের কিছু আছে, যে দুর্দশাবোধ থেকে ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা যারা চালিয়ে থাকে, সেই বামপন্থীরা স্থায়ী মোর্চা গড়ে তুলতে এত অকার্যকর? কিন্তু এ রকম মোর্চা ছাড়া তো আমূলপরিবর্ত্তনকামী রাজনীতির কোনই আশা নেই। কোন যাদুবিদ্যা পারদর্শী বৈজ্ঞানিক লেনিনবাদী দল আমাদের সমাজতান্ত্রিক মুক্তির দিকে নিয়ে যাবেনা। উদারনৈতিক জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের (liberal-welfare state) ওপর আধিপত্য করছে একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সরকারী আমলারা এবং কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ স্বার্থের বাহকরা। বর্ণবাদ, লিঙ্গবৈষম্য বাদ, ইহুদি-বিদ্বেষ, দারিদ্র এবং এরকম আরও অনেক বিষয়ে ক্রুদ্ধ হবার কারণ আছে এমন নানা গোষ্ঠীকে নিয়ে সেই হয়েও-হতে-চায়না এমন রামধনু রঙের মোর্চা গঠন ছাড়া স্থায়ী গভীর সামাজিক পরিবর্ত্তনের আশা আর কোথায়? কিন্তু কেবলমাত্র ক্রোধই যদি রামধনুর প্রতিটি রঙকে সক্রিয় করে থাকে, তবে কিসে তাদের একসাথে ধরে রাখবে? আমরা আজকে যা হয়ে উঠেছি সেটা যদি শুধু দুঃখ ও কষ্টের দরুনই হয়ে থাকি, তবে আমরা অন্যান্য ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে কি করে দেখতে পাব?

বিশেষভাবে সেই সব ইতিহাস যদি অন্য ধরণের রণকৌশল, মূল্যবোধ, অন্য নানা মহলের স্বার্থের দিকে নিয়ে যায়? অন্যদেরকে যারা তাদের শিকার বানাচ্ছে কেবল তাদের দিয়েই যদি আমার গোটা ভুবন ভরা থাকে, তবে মিত্রদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার সাহস ও স্থৈর্য আমাদের কোনদিনই আসবেনা, শত্রুদের থেকে বন্ধুদের পার্থক্য করার যোগ্যতাও আমরা অর্জন করতে পারবো না। উৎপীড়নের সরাসরি যারা শিকার, শুধু তাদের বেলাতেই যে একথা প্রযোজ্য তা নয়, উৎপীড়িতদের হয়ে যারা কাজ করছেন, তাদের বেলাতেও একথা একই রকমভাবে খাটে। যেসব আমূলপরিবর্ত্তনকামীরা রঙে সাদা, লিঙ্গে পুরুষ, শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত, তাদের ক্রোধই কখনও কখনও সবচেয়ে সোচ্চার ও ক্ষমাহীন।

আমি একথা বলছিনা যে আমাদের ন্যায্য ক্রোধ-কে অবদমন করা উচিৎ বা আমূলপরিবর্ত্তনকারীরা সব সন্ত হয়ে উঠবে এমন আশা করা উচিৎ। কথাটা এই যে, চলমান বিশেষ বিশেষ জীবনধারা এবং গোষ্ঠীদের মধ্যেকার যে নির্দ্দিষ্ট নানা সম্পর্ক, রাজনীতিকৃত (politicized) ক্রোধ কিভাবে ও কতটা তাতে খাপ খাচ্ছে সেটার মূল্যায়ণ অবশ্যই করতে হবে। ক্রোধেরও রকমফের আছে। ভঙ্গীমাসর্বস্ব ক্রোধ, আমিই ঠিক এই ধারণা সঞ্জাত ক্রোধ, তিক্ততাভরা এমন ক্রোধ যা সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, এক জায়গার ক্রোধের অন্য জায়গায় বিস্ফোরণ, অন্ধ ক্রোধ, অসহায় ক্রোধ, বদ্‌মেজাজী হৈ চৈ, ক্রোধন্মত্তত্ব— এমন সব চেহারার ক্রোধ, আর এক স্বাস্থ্যকর বিদ্রোহী 'ক্রোধ'—এই দুই জিনিষ এক নয়। বিভিন্ন চেহারার এই যে ক্রোধ, তারা বিভিন্ন ধরণের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার ইঙ্গিতবাহী। তাৎক্ষণিক নানা অনুভূতির স্পন্দন, কিভাবে চলমান ব্যক্তি বা গোষ্ঠীজীবনের ইতিহাসে অঙ্গীভূত হয়েছে, তার ইঙ্গিতও ক্রোধের এই নানা চেহারা থেকে পাওয়া যায়। ক্রোধের উপযোগীতা থাকতে পারে এবং কখনও কখনও তা দরকারও। কিন্তু তাই বলে বিপ্লবী সঠিকতার এক ছাপ্পা বলে ক্রোধকে গৌরবান্বিত করার কোন প্রয়োজন নেই। একে অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং এক সমালোচকের বিশ্লেষণী চোখ নিয়ে তার মধ্যে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

সামাজিক পরিবর্ত্তনের রাজনীতিতে ক্রোধের ফলাফল সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ এবং আমি যাকে বলেছি অহং (আগের সংখ্যার বিওবি দ্রষ্ঠব্য— অনুঃ)—এই দুই-এর মধ্যে যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, সেটা দেখতে পাওয়া কঠিন কিছু নয়। শিকার বনে যাওয়ার মানসিকতা থেকে জাত এই ক্রোধ ব্যক্তিতন্ত্রেরই একটা রূপ হিসেবে থেকে যায়। অন্যদের প্রতি ঘৃণা বিনা এ নিজের শক্তিকে অনুভব করতে পারেনা। দোষারোপ ছাড়া এ নিজের বেদনাকে অনুভব করতে পারে না। অবিরাম ক্রোধান্বিত না থেকে এ নিজের ন্যায্য পাওনাকে পাওয়ার চেষ্টা করতে অক্ষম।

আমি মনে করি না, উৎপীড়নকে চেনা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে চিরকালই কেবলমাত্র এই ধরণের প্রতিক্রিয়ার সাথেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। আমূল পরিবর্ত্তনকামী রাজনৈতিক কাজকর্ম কেবল ক্রোধ জাগিয়ে তোলা এবং যন্ত্রণা ও কষ্টকেই চিনতে পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন কথা নেই। সমব্যথীত্ব (compassion) ও ভালবাসাও তাকে পথ দেখাতে পারে।

সমব্যথীত্ব বলতে আমি আক্ষরিক অর্থেই অন্যের সাথে এক হয়ে অনুভব করাকে বোঝাতে চাই। এই অনুভূতি যুগপৎ আবেগগত (emotional) এবং বুদ্ধিগত (intellectual) এক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে আমি নিজের বেদনাকে যেভাবে দেখি, ঠিক সেভাবেই দেখি অন্যের বেদনাকেও। আমি যখন কল্পনা করতে সক্ষম হই যে, আমার যেমন নানা অনুভূতি রয়েছে, অন্যদেরও তাই রয়েছে, তখনই এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হতে পারে; অর্থাৎ যখন আমার নিজের বেদনার আমি এতটা দাস নই যে অন্যেরা যে বেদনা অনুভব করছে তার সাথে যুক্ত হওয়া থেকে সেই দাসত্ব আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এর অন্যতম অর্থ এই যে এই ধরনের তুলনামূলক মূল্যায়ন থেকে বিরত থাকবো ঃ নিধন যজ্ঞ কি দাসত্ব থেকে আরও খারাপ? প্যালেস্তানীয়দের স্বদেশভূমি থেকে নির্বাসন কি আরব দেশগুলি থেকে ইহুদিদের নির্বাসনের মত একই মাপের? কালোরা কি পুয়ের্তরিকান বা কাম্বোডিয়দের চেয়েও বেশী দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে? এরকম ভাবার বদলে, আমি এই উপলব্ধিকে হৃদয়ের মধ্যে আবাহন করবো যে, যারাই মানুষ, তারাই কষ্ট পায়। এই উপলব্ধি-তে যদি আমি পৌঁছাতে পারি তবে অন্য যারা বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে, তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহার না করেই আমি আমার নিজের কষ্ট দুঃখকে স্বীকার করতে পারি, তার মুখোমুখি হতে পারি, তাকে অনুভব করতে পারি, তাকে জানতে পারি। যন্ত্রণা ও দুঃখ যদি মানবিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়, এবং যদি কেবল আমি বা আমার গোষ্ঠীরই তাতে অভিষিক্ত হবার বিশেষ কোন অধিকার না থাকে, তবে বিশেষভাবে কোন প্রতিবিধানেরও আমার আর দরকার পড়েনা। দরকার পড়ে, মানুষ মাত্রেরই যাতে ন্যায্য

অধিকার সেই শোভন মানবিক ব্যবস্থা ও আচরণের। আমার যন্ত্রণা, আমার কষ্ট, অন্যদের সাথে যুক্ত বোধ করার এক ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে, কারণ তখন আমি সহজেই বুঝতে পারি যে আমার যন্ত্রণা আমার কাছে যতখানি সত্য, তাদের যন্ত্রণাও তাদের কাছে তাই। সম্ভোগ ও ভোগদখল যেখানে আরও আরও চাওয়ার প্রতি আসক্তির জন্ম দেয়, আমাদের বেদনা ও দুঃখ সেখানে সমব্যথীত্বে মুক্তি ঘটাতে পারে। অমাদের নিজ নিজ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই আমরা গোটা দুনিয়াকে সত্যি করে বুঝতে পারি। এই জ্ঞান বা উপলব্ধির কথা একমাত্র তখনই উঠতে পারে, যদি আমরা অহং এর ব্যক্তিতান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করার কাজে আমাদের সমব্যথীত্ব বোধকে ব্যবহার করতে পারি, যাতে এই দেশে কালো ও ইহুদীদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয়, সেতু তৈরী হয় নিধন যজ্ঞের মধ্যেও যারা টিকে গেছে সেই ইহুদি ও প্যালেস্তানীয়দের মধ্যে, নর ও নারী-রা মধ্যে, অথবা আয়, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির দিক থেকে নানা স্তরে বিভক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে— পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে হলে যাদের সবারই ঐক্যবদ্ধ হওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন সমব্যথীত্বে ভরা *বুদ্ধিগত কল্পনা* (intellectual imagination) ও এক আবেগমুক্ত *আত্মসমীক্ষা* (self-examination)। যখন আমাদের কষ্ট ও ক্রোধের সাথে নিজেদের একেবারে এক করে ফেলি, তখন অন্যদেরকে বোঝা বা সততার সাথে নিজের মূল্যায়ণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা যদি এক শত্রুতে ভরা দুনিয়ার শিকার মাত্র হই, তবে কেন আমাদের উৎপীড়কদের মনের মধ্যে কি হচ্ছে, তার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করবো? আমরা যদি কষ্ট ও দুঃখের সার্বজনীন চরিত্রকে বুঝতে পারি, একমাত্র তখনই আমরা বুঝতে শুরু করবো যে লোকেরা যা করে, তা কেন করে। এমন কি শাসকশ্রেণীরও নিজস্ব দুর্দশা আছে। সেটার দরুণ তাদের আচরণ ক্ষমতার কষ্টিপাথরে যোগ্য হয়ে ওঠেনা বা তাদের বিশেষ সুবিধা ভোগের ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়না। কথাটা এই যে উৎপীড়কদের শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে আমাদের থেকে পুরোপুরিভাবে আলাদা কিছু ভাবার দরকার নেই।

এই উপলব্ধির পথে আমরা অনুত্তেজিতভাবে আমাদের নিজেদের খাম্‌তির কথা ভাবতে পারি। ভাবতে পারি কিভাবে আমরা অবিচারের শুধু শিকারই হয়েছি তা নয়, কখনও কখনও অবিচারের বাহন হিসেবেও কাজ করেছি। কেমন করে চিন্তাহীনভাবে, বেখেয়ালবশত ও শীতল নির্লিপ্তি দিয়ে আমরা নিজেরা অন্যের কষ্টের কারণ হয়েছি, বা অন্যের কষ্টকে উপেক্ষা করেছি, এটা যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তো সেই উপলব্ধি, 'আমিই ঠিক' এই অহংকারজাত ক্রোধ থেকে, উৎপীড়িতদের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে ও সর্বোপরি সবসময়ে শিকার বনে থাকার মানসিকরা থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের সাহায্য করতে পারে। আমরা দেখতে শুরু করি নিজেদের মধ্যেকার ক্ষুদে এক দাসমালিককে, আমাদের আত্মার মুকুরে ছোট্টভাবে প্রতিবিম্বিত এক নাৎসীকে। এটা তো সত্যি যে 'শিকার' বনে যাওয়া জাতি গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যেও রয়েছে নারী নির্যাতন, সম্পদ ও সুবিধাভোগের দিক থেকে আভ্যন্তরীণ উঁচুনীচুবাদ (hierarchy) বা সমকামীতা বিদ্বেষ। যেমন এর সাক্ষী হয়ে রয়েছে ভোটের অধিকার অর্জনের জন্য কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে মোর্চা—যা উভয় গোষ্ঠীর নারীদের অধিকারকে উপেক্ষা করেছে।

নিজেদের ও অন্যদের বুঝতে পারাটা এক ফলপ্রসূ (productive) ক্ষমাশীলতার ভিত্তি—যা আদৌ নিষ্ক্রিয়তা নয়। এই মনোভাবে থেকে আমরা স্বীকার করি যে আমরা, দুনিয়ার সবচেয়ে উৎপীড়িত গোষ্ঠীও অন্যদের কষ্টের কারণ হয়েছি। নিজেদের সমস্ত কাজকর্ম পরীক্ষা করে এবং যে সব চিন্তা ও অনুভূতি সেইসব কাজে নিয়ে গেছে তার পুনঃনির্মাণ করে (rieconstructing) আমরা অন্যদের কার্যকলাপের কারণ গুলিকেও পুনর্নির্মান করতে শিখি। এবং হঠাৎই যেন তাদেরকে আর তত দুর্বোধ্য, তত আলাদা মনে হয়না। তাদেরকে অনেকদূর অবধি নিজেদের মতই মনে হয়।

এসবের কোনটারই অর্থ এ নয় যে আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, বা আরও ভাল এক দুনিয়াকে গড়ে তোলার সংগ্রাম পরিত্যাগ করবো বা কোন ধরণের নিপীড়নকে মাপ করে দেবো। এর মানে এও নয় যে, আমাদের নিজ নিজ গোষ্ঠী যে যন্ত্রণা ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে এসেছে তাকে ভুলে যাবো। আমরা যদি যন্ত্রণা ও দুঃখকে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ না করে থাকি, বাস্তবে ও কল্পনায় অনুভব না করে থাকি এবং তার দ্বারা নিশ্চিতভাবে চালিত না হয়ে থাকি, তো না বুঝতে পারবো নিজেদেরকে, না বুঝবো দুনিয়াকে; আরও ভালোর দিকে বদ্‌লানোর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারবো না। আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা, কৌতুক ও দুঃখ, শিল্প ও সংগীত, আমাদের সন্তানদের আমরা কি গল্প বলবো, সে সবেরই অত্যাবশ্যক উপাদান আমাদের যন্ত্রণা ও দুঃখবোধ।

একই রকমভাবে আমাদের ক্রোধও স্বচ্ছন্দে থেকে যেতে পারে। এমনকি সময় সময় আমরা ক্রোধকে জাগিয়ে তুলতে চাইতেও পারি—তাদের মধ্যে, যারা আত্মঘৃণা,নিষ্ক্রিয়তা বা অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তথাপি এ প্রশ্ন আমরা করতেই পারি কে আমাদের আদর্শ? কারা আমাদের শিক্ষক?..... যাদের প্রধান রাজনৈতিক বাণী রাগ বা ঘৃণার, নাকি যাদের বাণী ভালবাসা-র ও সমব্যথীত্বের? আমূলপরিবর্ত্তনকামী সম্প্রদায় বা সেই সংক্রান্ত আলোচনা গড়ে তোলার চেষ্টাকালে কোন কোন গুণ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে এবং কোন কোন মানবিক দুর্বলতাকেই বা আমাদের বোঝার দরকার হবে? এই অর্থেই যন্ত্রণা ও ক্রোধ থেকে সমব্যথীত্ব ও ভালবাসার অভিমুখে যাত্রা সম্ভব।

মার্কসবাদী সূক্ত ব্যবহার করে বলা যায় যে এই যাত্রার অর্থ আমরা আবশ্যিকতার জমানা থেকে স্বাধীনতার জমানার(4) দিকে চলেছি। অতীতের বেদনাকে অস্বীকার করে নয় বরং তারই মধ্য দিয়ে পথ চলে এবং তাকে ছাড়িয়ে গিয়েই আমরা অতীতের বেদনা থেকে আমাদের আত্মগত চেতনার (Subjectivity) মুক্তি ঘটাই। সবচেয়ে ইতিবাচক অর্থে এই যাত্রা আমাদেরকে সেই দিকে নিয়ে যায়, যেদিকে রয়েছে রাজনৈতিক কার্যকারীতা এবং গোষ্ঠীগতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাবোধ সম্পন্ন হয়ে ওঠা। সমব্যথীত্বের মধ্যে আত্মঘৃণা, আত্মধিক্কার-এর কোন অবকাশ নেই। নেই অবনয়ন (degradation)-কে নীরবে মেনে নেওয়া। সার্বজনীন ভালবাসা ও ক্ষমার মধ্যে ফৌজীবাদ (militarism), সহিংস জাতীয়তাবাদ, বা শোষণের প্রতি কোন সহনশীলতা নেই, বা জাতি বৈষম্যবাদ, জাতিকেন্দ্রিকতাবাদ (ethnocentrism)বা নারী বিদ্বেষ গ্রহণ যোগ্য নয়। ক্রোধের শ্বাসরোধকারী মুঠিকে একবার যদি আমরা আলগা করে দিতে পারি, তবে আরও সহজে শ্বাস নিতে পারবো, আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবো। সত্যিকারের অর্থে যত বেশী আমাদের ভালবাসার ক্ষমতা বাড়বে ততই আমরা অন্য মানুষদের বুঝতে পারবো ও তাদের সাথে কাজ করতে পারবো এবং প্রয়োজনে আপোষে বা আপোষের উদ্দেশে আলোচনায় যেতে পারবো। আদর্শ পরিস্থিতিতে, সমব্যথীত্ব ও ভালবাসার আত্মিক শক্তি যদি আমূলপরিবর্ত্তনকামী রাজনৈতিক পরম্পরার বিশ্লেষণী ক্ষমতা, ভবিষ্যতের মূর্ত্ত ছবি ও দৃঢ়তার সাথে সংযুক্ত হয়, তবে প্রগতিমুখী রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের এক শক্তিশালী স্রোত সৃষ্টি হতে পারে।

অবশ্যই এটা সহজ হবে না। উৎপীড়ন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রাত্যহিক যে টানাপোড়েন ও বেদনা, তারই মধ্যে যদি আমরা ডুবে থাকি তো হতাশা ও ক্রোধের হাত থেকে মুক্ত থাকা খুবই কঠিন। আমরা যদি আত্মিক জীবনের স্নিগ্ধকর অভিজ্ঞতার পেছনে ছুটি তো এইসব আত্মিকতার অনুশীলন ও চর্চা যে প্রশান্তির অভিজ্ঞতা দেয়, তার প্রতি আসক্ত হয়ে না পড়াটা কঠিন। তবে আমার বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়ে থাকে তো, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সফল হতে পারে না। আত্মিকতা-বিযুক্ত রাজনীতিক যেমন কেবল ক্রোধ ও সংঘর্ষের মধ্যেই আটকে থাকে, তেমনই যে আত্মিকতা সমাজমুখীনতার মূল্যে আত্মিক প্রশান্তির পেছনে ছোটে সেটা অহং-এর আর একটা প্রকাশ মাত্র।

অনুবাদ ঃ সুভাষ গাঙ্গুলী

টিকা (অনুবাদকের) ঃ (1) **ফ্রানজ্ ফ্যানন** (Frantz Fanon) (1925-1961) : ফরাসী-আলজেরীয় বংশোদ্ভুত। শিক্ষা ফরাসী দেশে। তৎকালীন ফরাসী উপনিবেশ আলজেরিয়াতে মনোরোগ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, আলজেরিয়ার মানুষের ফরাসী উপনিবেশ বিরোধী উত্তাল মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন, যদিও আলজেরিয়ার মুক্তি লাভের আগেই মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থ THE WRETCHED OF THE EARTH। এখানে তিনি উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে হিংসার ব্যবহারের স্বপক্ষে জোরালো তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থিত করেন। হিংসার উপযোগিতা সম্পর্কে এই নিবন্ধে উল্লিখিত তাঁর বক্তব্য ঐ গ্রন্থেই আরও বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে।

(2) **অ্যাড্রেনালিন** (Adrenalin) ঃ অ্যাড্রেনাল (Adrenal) নামের অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (Endocrine Gland) থেকে নিঃসৃত অন্যতম একটি হরমোন (অর্থাৎ বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ), যা কোন প্রবল নেতিবাচক আবেগের (ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি) সময় সরাসরি রক্তে মিশে গিয়ে যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদিকে অতিরিক্ত সক্রিয় করে তোলে। ফলে মুহূর্ত্তের মধ্যে শক্তি ও রক্ত সরবরাহের হার বৃদ্ধি পায়। শরীর জরুরী অবস্থার মোকাবিলায় (অর্থাৎ প্রত্যাঘাত বা পালানোর জন্য) আরও প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

(3) **নীটশে** (Friedrich Wilhelm Nietsche)(1844-1900): গত শতাব্দীর অন্যতম খ্যাতনামা জার্মান চিন্তাবিদ, যিনি 'অতিমানব' (Superman) ধারণার জন্মদাতা হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। আজন্ম ক্ষীণদৃষ্টি, ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং স্নায়ু ও অন্যান্য নানা রোগে চিররুগ্ন। ব্যক্তিগত জীবনে কোমল ও মৃদুস্বভাবসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর রচনা ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা-র স্বপক্ষে এক জোরালো, আগুন ঝরানো সওয়াল। ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত। দর্শনের অধ্যাপনা করেছেন। পদ্যছন্দে রচিত THUS SPAKE ZARATHUSTRA তাঁর সবচেয়ে পরিচিত রচনা। সেখানে জরাথুস্ত্র ঘোষণা করছেন " ভগবানেরা সব মৃত। এখন আমাদের আকাঙ্খা যে অতিমানব বেঁচে থাকুন।" এই রচনার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারান। দশ বছর পরে মারা যান। ভারসাম্য আর ফিরে আসেনি।

শেষাংশ 32 পৃষ্ঠায় দেখুন

স্কোলিওসিস— মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া রোগ

প্রতিদিনের কাগজ পড়ে, নিত্যকার অভিজ্ঞতাও মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার যে পাহাড় মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, যাদবপুরের দূরপাল্লার রেলের আসন সংরক্ষণ অফিসের কাউন্টারের মানুষটির আচরণে সেটা যেন একটু নাড়া খেল। ভদ্রলোক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, মুখ তুলে বল্লেন "অসুখটি কার"?

--"আমার মেয়ের" মাদ্রাজের এক ডাক্তারের ফ্যাক্স পেয়ে, চিঠিটি নিয়েই হাজির হয়েছিলাম টিকিট কাউন্টারে। মাত্র সাত দিন সময় থাকতে। যাবার টিকিট নিঃশেষিত, একটা 'অপেক্ষা তালিকার' টিকিট পেলাম। কিন্তু ফিরব কিভাবে? কাউন্টারের ভদ্রলোক নানান গাড়ির হিসেব করে শেষ পর্যন্ত ফেরার ব্যবস্থা করতে পারলেন। মুখে পরিতৃপ্তির মিষ্টি হাসি,"পেয়ে গেছেন দাদা। বেশ চিন্তায় পড়ে গেছিলাম।"

কিসের চিন্তা ওনার? কিসের সমস্যা ওনার?

ঘটনার সূত্রপাত এর মাস চারেক আগে। মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ঘাড় গুঁজে পড়ে পড়ে ঘাড়ে ব্যাথা। ভাবলাম ওর কষ্ট একটু লাঘব করার চেষ্টা করি। এক বিখ্যাত বেসরকারি হাসপাতালের ততোধিক বিখ্যাত হাড়ের ডাক্তার ডাঃ ব্যানার্জির সঙ্গে 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করতে পেরে নিজেকে সার্থক নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। গোলমাল পাকাল তার পরে। কোথায় ঘাড়ের ব্যাথা, কোথায় কী; গম্ভীর মুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বল্লেন "স্কোলিওসিস"। অচেনা একটা রোগের নাম শুনে বাবা এবং মেয়ে দুজনেরই মুখ ফ্যাকাসে- - "এতে কি হয়?"

ইতিমধ্যে বিখ্যাত ডাক্তার বাবু ইন্টারকমে রেডিওলজি বিভাগ থেকে এক কর্মীকে এনে হাজির করেছেন, "এই মেয়েটির X Y Z থেকে PQR পর্যন্ত এক্সরে করে, মেয়েটির হাত দিয়েই তা পাঠিয়ে দাও। এক্ষুনি।" পরিবেশ আরো ঘন হল। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এর মধ্যে আবার এসব কি? দশ মিনিটের মধ্যে জলে ভেজা এক্সরে প্লেট হাতে মেয়ের প্রবেশ। মুহূর্তের দৃষ্টি নিক্ষেপ—কনফার্মড্ ডায়াগনোসিস। স্কোলিওসিস।

কালচে মুখে ভয়ে ভয়ে মেয়ে জানতে চাইলে, "এতে কী হয় ডাক্তার বাবু?" স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাক্তারবাবা জানালেন "বড্ড খারাপ রোগ মা। দেখছ তোমার শিরদাঁড়া ডান দিকে বেঁকে গেছে, আস্তে আস্তে আরো বেঁকবে। বেঁকতে বেঁকতে....."

"এর কারণ? এর চিকিৎসা?"

"আমার হাতের বাইরে। মুষ্টিমেয় কিছু জায়গায় এর চিকিৎসা হয়। বম্বের মাদ্রাজের..... কলকাতার.....।

কোন রকমে নিজেকে ঠিক রেখে মেয়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরলাম। সেদিনের কথা সারা জীবন মনে থাকবে। মনে থাকবে কিভাবে আমরা তিনজন কাটালাম কয়েক সপ্তাহ, যতক্ষণ না মাদ্রাজের ভেলোর হাসপাতালের হাড়ের ডাক্তার এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেরুদন্ড বিশেষজ্ঞ, ডঃ সুন্দররাজের চমৎকার চিঠিটি পেলাম। লিখলেন "স্থির হোন। অহেতুক উদ্বিগ্ন হবার মত রোগ নয় এটা। ধীরে সুস্থে আমার এখানে আসুন। আমি আপনার মেয়ের চিকিৎসা করব। তাকে সুস্থ করে তুলব।" মাদ্রাজের অ্যাপোলো হাসপাতালের ডাঃ হেগড়ে বল্লেন এক্সরে প্লেট পাঠাতে। সংগে দিলেন তাঁর বাড়ির টেলিফোন নম্বর। "যখন খুশি যোগাযোগ করবেন।"

এক্সরে প্লেট পাঠিয়ে ফোন করলাম ডাক্তার হেগড়েকে। ফোনে উনি যা বল্লেন তা বিস্ময়কর। "আপনার পাঠান এক্সরে প্লেটের মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের। রিপোর্টে যা যা লেখা আছে তা ঐ এক্সরে প্লেট দেখে লেখা যায় না। আপনার মেয়েকে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে বলুন—তারপর আমি ওকে দেখব। সম্ভবত ওর কিছুই হয়নি।" এই কথা কটির যে কি বিশাল প্রভাব পড়েছিল তখন, তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। শুধু বলতে পারি—অনেক দিন পর আমরা তিন জন পরস্পরের দিকে চেয়ে থেকে ছিলাম অনেকক্ষণ আর শব্দহীন হাসিতে ভরে গিয়েছিল ঘর। ডাক্তার হেগড়ের ফ্যাক্স চিঠি পেয়েই, মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে রওনা হলাম মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে, এমার্জেন্সি কোটায় যাবার টিকিট পেয়ে।

মাদ্রাজ মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সংরক্ষিত শয়ন যান। আমাদের তিনটি বার্থ—একতলা, দোতলা, তিনতলা। ঠিক সামনেই একতলায় শুয়ে আছেন এক মাঝ বয়সী মানুষ। মাথার কাছে ওনার স্ত্রী বসে, পায়ের কাছে এক স্বাস্থ্যবান পুরুষ। পরে জেনেছি উনি শায়িত ভদ্রলোকের শ্যালক, যিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুবাদে মাদ্রাজ অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ওঁরা সকলেই মালদার এক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা। সেদিনই সকালে মালদা থেকে কোলকাতায় এসে হাওড়া স্টেশনেই দালাল মারফত টিকিট পিছু একশ টাকা বাড়তি দিয়ে নিজেদের নামেই মাদ্রাজের টিকিট কেটেছেন। উপায় নেই, কারণ শুয়ে থাকা ভদ্রলোক বিদঘুটে এক হার্টের রুগী।

ভেলোর হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। বিশেষ ধরণের কিছু শারিরীক গণ্ডগোল দেখা দিলে সাথে সাথেই ভেলোর যেতে হয়। মালদা এবং কলকাতার সরকারী-বেসরকারী-আধাসরকারী, হরেকরকম হাসপাতালের রকমারি রংবাহারী ডাক্তারদের কৃপায় এক চতুর্থাংশ জমি বন্ধক দিয়ে আর এক চতুর্থাংশ জমি বেচে তিনি জানতে পেরেছেন যে রোগটি তাঁর দূরারোগ্য এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন। অগত্যা—ঐ এক্স মিলিটারি শ্যালকের পরামর্শে ভেলোর যাওয়া। সেখানে তাঁরা অনেক কিছু পেয়েছেন। পেয়েছেন মানবিকতা, পেয়েছেন চিকিৎসা—আর জেনেছেন রোগটি মোটেই দূরারোগ্য নয়। যে শল্য চিকিৎসার জন্য কলকাতার ডাক্তাররা তাঁকে নানা ভাবে প্ররোচিত করেছিল এবং নেহাৎ গ্রাম্যভয়ে যার কবলে তাঁকে পড়তে হয়নি, সেই শল্য চিকিৎসার কোন প্রয়োজন যে নেই তাও তাঁরা জেনেছিলেন ভেলোর গিয়েই। মলিন বস্ত্রে, পুঁটুলি ভরা মুড়ি নিয়ে বছরে দুবার তাঁদের ভেলোর যেতে হয়। সেখানে তাঁরা পান কম পয়সায় থাকার জায়গা আর প্রমাণ দাখিল করতে পারলে কিছুটা কম খরচে চিকিৎসা।

আমাদের ঠিক ডান দিকে, সাইড বার্থে এক যথেষ্ট কম বয়সী ভদ্রলোক। চোখে মোটা কাচের চশমা থাকা সত্ত্বেও নড়াচড়াটা যেন কেমন কেমন লাগছিল। সংগে দশ বছর আগে অবসর নেয়া কাকা। বল্লেন "চোখটা ওর একে বারেই গেছে। কলকাতার ডাক্তারদের কল্যাণে আগেই হয়ে গেছিল, ওদের কাছে যাবার পর দেখি একটু দেখতে পায়।"

ওরা কারা? কাদের কাছে গিয়ে আবার একটু আধটু দেখতে পায়?

" শঙ্কর নেত্রালয়। বলেছে আশি ভাগ ঠিক হয়ে যাবে। কুড়ি ভাগ হবে না। দেখি কি হয়।"।

দেখি, এক বৃদ্ধা তাঁর ছেলের হাত ধরে টয়লেট যাচ্ছে। ছেলে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মী। "এখন কি দেখছেন। প্রথম বার মাকে ষ্ট্রেচারে করে মাদ্রাজ নিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে স্যালাইন, ব্লাড আর পাড়ার ডাক্তার। মা এখন ভাল আছে।

ভক্তরা যেমন দেবস্থানে যায়, তেমনি দলে দলে চলেছি আমরা মাদ্রাজ। ভগবানের সন্ধানে নয়— চিকিৎসার সন্ধানে! কেন যায় মানুষ মাদ্রাজে? কলকাতায় কি হাসপাতাল নেই? কলকাতায় কি ডাক্তার নেই? কলকাতার হালপাতালে কি অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে না? কলকাতার ডাক্তাররা সকলেই কি অযোগ্য, অক্ষম বা অসৎ? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে সবটা তেমন নয়। তাহলে তফাৎটা কোথায়?

আমি ভেলোর হাসপাতালে পা রাখার পরেই বুঝেছি তফাৎটা কোথায়। এখানকার সরকারী হাসপাতালের বর্হিবিভাগে সকালবেলা যে চেহারাটা থাকে অবিকল তেমন চেহারা ভেলোরেও। রুগীর সংখ্যা আরো অনেক বেশি। কিন্তু কেমন যেন একটা অদৃশ্য নিয়মের নিগড়ে বিশৃঙ্খলাটি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। সকাল পৌনে এগারোটায় হাসপাতালে ঢুকে, ঐ ভীড় ঠেলে, এগারোটাতেই জেনে গেলাম কখন দেখা পাব সেই মানুষটির, যার জন্য এত দূরে আসা।

সকাল নটা থেকে এক নাগাড়ে রুগী দেখে দেখে ক্লান্ত সেই মানুষটির দেখা পেলাম বিকেল চারটে নাগাদ। মিনিট তিনেক দুচারটে কথা, এক্সরে প্লেট খাম থেকে বার করা, মেয়ের পিঠে দুবার হাত বোলান। আমায় চমকে দিয়ে ডঃ সুন্দররাজ বল্লেন "ওকে পাঁচটার সময় আমার চেম্বারে নিয়ে আসুন"। আমি যেখানকার মানুষ তাতে চেম্বারে নেবার অর্থ আমার জানা। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জেনে গেলাম কলকাতার হাসপাতালের ' আমার চেম্বার' এর অর্থ আর ভেলোরের ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজের 'আমার চেম্বারের' অর্থ এক নয়। ডাঃ সুন্দররাজ আমাকে ওনার হাসপাতালের বসার ঘরটিতেই মেয়েকে নিয়ে যেতে বলেছেন, যেখানে উনি বিশেষ ক্ষেত্রের রুগী দেখেন। তার জন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় না।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট তিনি আমার মেয়ের জন্য ব্যয় করেন। এক্সরে প্লেটে মেরুদণ্ডের চ্যুতিকোন নির্ণয় করেন এবং মেয়ের সর্ব অঙ্গের সমস্ত হাড় ও তার সংযোগ স্থলের পরীক্ষা করেন। দীর্ঘ পারিবারিক হাড়ের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তিনি রোগ সম্পর্কে খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু আমাদের বুঝিয়ে বলেন। সংক্ষেপে বলি— আদর্শ সোজা মেরুদণ্ড হয়না। হয় ডানদিকে অথবা বাঁদিকে একটু বেঁকে থাকে। সেই বাঁকা যদি কোমরের সঙ্গে ত্রিশ ডিগ্রির বেশি কোন তৈরী করে তবেই তাকে স্কোলিওসিস বলা হয়, অন্যথায় নয়। পঞ্চাশ ডিগ্রির বেশি না বেঁকলে চিকিৎসার কথা ভাবা হয়না। আমার মেয়ের মেরুদণ্ডের চ্যুতিকোন স্বাভাবিক পর্য্যায়ের—অর্থাৎ ওর স্কোলিওসিস নেই। কিন্তু, অবৈজ্ঞানিক জীবন যাত্রার জন্য (খেলা ধূলা ও স্বাভাবিক জীবন যুদ্ধ না থাকা) হাড়ের সংযোগ স্থলে গোলমালের উৎপত্তি। তার জন্য ব্যবস্থা—ব্যায়াম।

মিনমিনে গলায় বল্লাম— "কিন্তু কলকাতার এত বড় ডাক্তারবাবু যে বল্লেন স্কোলিওসিস!"

"Had he seen X-ray Photograph of his own spine?"

ভেলোর থেকে আমরা তিন জন সোজা চলে গেলাম উদাগামণ্ডলম, ডাক নাম উটি।

শঙ্কর ঘটক

মোটর গাড়ীর দূষণ ও ইউরোবিধি

ওমপ্রকাশ চক্রবর্তী, রবীন মজুমদার

কলকাতায় ইউরোবিধি

কলকাতায় চলা মোটর গাড়ীর গ্যাস ও ধোঁয়ার দূষণের ব্যাপারে বেশকিছু নতুন নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হল গত 4 ঠা জুন, 1999-এ। ঐ দিন মহাকরণের রোটাণ্ডায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পরিবেশমন্ত্রী এবং পরিবহনমন্ত্রী "কলকাতার বাতাসের গুণগত উন্নতির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ" নামে একটি নোট প্রেসের হাতে তুলে দেন। নোটে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে কলকাতার বাতাসে বিভিন্ন দূষক পদার্থের (pollutants) উপস্থিতি বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে গেছে। গত দুই শীতে কলকাতায় শ্বাসযোগ্য মিহি ধূলিকণার পরিমাণ ছিল 373 মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার বাতাসে। নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রতি ঘনমিটারে ছিল 110 মাইক্রোগ্রামের মত। কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ 3935 থেকে 5920 মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দূষক পদার্থের পরিমাণ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (Central Pollution Control Board) নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রার (Safe limits) থেকে অনেক বেশী। আরও জানা গেল কলকাতার বায়ুদূষণের অর্ধেকটাই হচ্ছে গাড়ীর গ্যাস ও ধোঁয়ার জন্য। গাড়ী নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়ার বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থের পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যে ঐ সরকারী নোটে কিছু নতুন নিয়মের কথা বলা হয়েছে এবং চালু দূষণমাত্রাগুলিকেও কিছুটা কঠোর করার উল্লেখ থাকে (বক্স দ্রষ্টব্য)।

সরকারী ঘোষণায় বাস ও ট্যাক্সি মালিকেরা বিপদের গন্ধ পান। তাঁদের বক্তব্য ছিলো যে সরকারি বাস এবং গাড়ীগুলি কোন দূষণবিধির তোয়াক্কা না করে সরকারি ছত্রছায়ায় বাতাসে দূষণ ছড়াচ্ছে। বিধিনিষেধের আরোপ শুধু তাদের বেলায় কেন? এই বিধিনিষেধের ধাক্কায় তাদের অনেকেরই কাজ-কারবার লাটে উঠবে। তাছাড়াও, তাদের মতে, ইউরো বিধি মানার জন্য যে অতিরিক্ত সরঞ্জামের (যেমন, বহুমুখী সূক্ষ্ম নলের ব্যবস্থা) দরকার, তা যথেষ্ট দামী। ইউরো মানা নতুন ট্যাক্সি/গাড়ী কিনতে গেলেও অনেক টাকার ধাক্কা। এতে ট্যাক্সিভাড়ার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ জনগণের উপর আর্থিক বোঝা বাড়বে। যাইহোক, সরকারী ঘোষণাকে ট্যাক্সি মালিকেরা ভাল মনে নিতে পারলেন না। প্রথমে ধর্মঘটের হুমকি, পরে 'টোকেন স্ট্রাইক', শেষে 7 ই জুলাই '99 থেকে অনির্দিষ্টকালের ট্যাক্সি ধর্মঘটের ডাক দেন ট্যাক্সি মালিকদের ইউনিয়ন। তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন বেসরকারী বাস ও মিনিবাসের মালিকদের ইউনিয়নগুলি। প্রতিবাদের তীক্ষ্ণতাকে বাড়িয়ে দিতে 7 ই জুলাই-এর পরিবর্তে 1 লা জুলাই'99 থেকে কলকাতার সব বেসরকারী বাস, মিনি বাস ও ট্যাক্সি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে

4 ঠা জুন' 99-এর সরকারী ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ

- ইউরো-1 বায়ুদূষণ বিধি মানে বলে উৎপাদক সংস্থা দ্বারা শংসিত না হলে, 1লা জুলাই' 99থেকে কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়া (CMA)-তে পেট্রোল/ ডিজেল চালিত নতুন অবাণিজ্যিক (ব্যক্তিগত) গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন বন্ধ।
- 1 লা এপ্রিল '2000-এর পরে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ইউরো-2 মানা আবশ্যিক।
- 4-চাকার গাড়ীর ক্ষেত্রে কার্বন-মনোক্সাইডের মাত্রা 4 থেকে 3 আয়তন শতাংশ করা হচ্ছে। 50 সি.সি.'র কম সিলিণ্ডার ডিস্‌প্লেস্‌মেন্টের 3- চাকার ও 2- চাকার গাড়ীর ক্ষেত্রে কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রা 5 থেকে কমিয়ে 4.5 আয়তন শতাংশ করা হচ্ছে। ডিজেলগাড়ীর ধোঁয়ার স্মোক্ স্ট্যান্ডার্ড লিমিট 70 থেকে 65 HSU (4.8 Bosch) করা হচ্ছে।
- 1 লা জানুয়ারী, 2001থেকে ট্যাক্সির পারমিট, 1989 এর পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেহিক্‌লস বিধিনিয়ম মেনে, কঠোরভাবে 15 বছরে সীমিত রাখা হবে। বিশেষ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে 15 বছরের পরে একসঙ্গে 2 বছর করে সর্বাধিক 5 বছর পর্যন্ত বাড়ানোর চালু পদ্ধতি বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। আপাতত, ট্যাক্সির পারমিটের উর্দ্ধসীমা 17 বছরের।

27শে জুন সরকার ঘোষণা করেন যে 4 ঠা জুনের প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞা আপাতত স্থগিত থাকছে। ইউরোবিধি প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই রাজ্য সরকারের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি পর্যালোচনা করবেন। গাড়ী নির্গত গ্যাস-ধোঁয়ার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নতুন নিয়মের প্রচলনকে কেন্দ্র করে মাসখানেকের দুর্ভোগ ও উত্তেজনার অবসান হলো। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সরকার হঠাৎ করে কেন ইউরোবিধি প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিলেন? আর কেনই বা এই পিছিয়ে আসা?

কোর্টের নির্দেশে 7 ই জানুয়ারী, 1998-এ গঠিত ভুরে লাল কমিটি সময়ে সময়ে রিপোর্ট দিয়ে চলেছেন এবং 1 লা এপ্রিল '99-এ কোর্টকে পেশ করা রিপোর্টে বলা হয় যে ব্যক্তিগত (অবাণিজ্যিক) গাড়ীর সংখ্যা NCR-এ চলাচলকারী মোটর গাড়ীর সংখ্যার 90 শতাংশ; রিপোর্টে আরও বলা হয় যে দিল্লীতে গাড়ী নির্গত গ্যাস-ধোঁয়ায় নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x) এবং শ্বাসযোগ্য মিহি ধূলিকণার (Respirable Particulate Matter, RSPM) 90 শতাংশেরও বেশীর কারণ হল ডিজেল চালিত

NCR-এ প্রযোজ্য গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়ার দূষণ সম্বন্ধীয় সুপ্রীম কোর্টের 16 ই এপ্রিলের নির্দেশের সার-সংক্ষেপ

- ইউরো- 2 বিধি মেনে তৈরী অবাণিজ্যিক (ব্যক্তিগত) গাড়ী NCR-এ রেজিষ্ট্রেশন হবে।
- 1 লা জুন '99-এর মধ্যে ইউরো-1 এবং 1 লা এপ্রিল, 2000-এর মধ্যে ইউরো-2 দূষণবিধি মেনে তৈরী হলেই, তবেই গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন, নতুবা নয়।
- মধ্যবর্তী সময়ে রেজিষ্ট্রেশন সুপ্রীমকোর্ট নির্ধারিত সংখ্যা-ভিত্তিক পর্যায় মেনে।
- ডিজেল ও পেট্রোল সব গাড়ীর ক্ষেত্রেই কোর্টের নির্দেশ বলবৎ থাকছে।
- গাড়ীর উৎপাদক সংস্থার পক্ষে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত (authorised) আধিকারিক, সংস্থা-নির্মিত গাড়ী কোন ইউরো-বিধি মেনে তৈরী তার শংসাপত্র দেবেন।
- ট্যাক্সির রেজিস্ট্রেশন ইউরো-2 বিধি মানলে, তবেই।

দিল্লীতে ইউরোবিধি

মোটর গাড়ী থেকে বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম লাগু করার রাজ্য সরকারী ঘোষণা দিল্লীতে প্রযোজ্য অনুরূপ আদেশের প্রভাবে বলেই মনে হয়, যদিও প্রেসনোটে তার কোন উল্লেখ নেই। গত 16 ই এপ্রিল '99 সুপ্রীম কোর্ট ন্যাশানাল ক্যাপিটাল রিজিওন (NCR-দিল্লী ও সন্নিহিত অঞ্চল)-এর জন্য গাড়ীর ধোঁয়াজনিত দূষণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশ দেন (বক্স দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টকে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হল কেন? ভারতে কি আগে থেকেগাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়ার দূষণ-সংক্রান্ত কোন নিয়মবিধি ছিল না? ইউরোবিধির প্রসংগই বা কেন উঠল? এ প্রসংগে সুপ্রীম কোর্টেরই বক্তব্য শোনা যাকঃ "এন্‌ভায়রন্‌মেন্ট (প্রোটেক্‌শন) অ্যাক্ট, 1986, প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশের গুণগত অবক্ষয় চলছেই। প্রাথমিকভাবে এটা কর্তৃপক্ষের তরফে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আইনের শাসন পালনে বিফলতাই নির্দেশ করে। বিশেষ করে ন্যাশানাল ক্যাপিটাল রিজিয়নের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের উপর গাড়ীর ধোঁয়াজনিত দূষণের প্রভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে, কোর্ট সময়ে সময়ে রাজ্য, কেন্দ্র এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষদের নির্দেশ জারি করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এসব নির্দেশ এবং কোর্টের উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও, দূষণের মাত্রা বাড়ছেই, কমছে না। এটা একটা গুরুতর বিষয়।

গাড়ীর দূষণ! ভুরে লাল কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কোর্ট 1999 -এর 16 ই এপ্রিল কিছু নির্দেশ দেন। মাননীয় অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকেও তা দেওয়া হয়। তাতে একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে হলফনামার মাধ্যমে কোর্টকে জানাতে বলা হয় NCR-এ 1997 বছরে, 1998 বছরে এবং 1999 -এর 1 লা জানুয়ারী থেকে 31শে মার্চের মধ্যবর্তী সময়ে রেজিষ্ট্রীকৃত পেট্রোল ও ডিজেল গাড়ীর সংখ্যা কত। অসম্পূর্ণ হলেও সেই তথ্য কোর্টকে জানানো হয়েছে।"

সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ জারির প্রেক্ষিতটা খানিকটা বোঝা গেল। আরও বোঝা গেল যে অপ্রত্যক্ষ কারণ যাই থেকে থাকুক, প্রত্যক্ষত সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ ও রাজ্য সরকারী ঘোষণার বিষয়বস্তু অভিন্ন।

ইউরোর উৎস সন্ধানে

বায়ুদূষণের প্রতিকারে সুপ্রীম কোর্টের রায় বা 4 ঠা জুনের রাজ্য সরকারী ঘোষণা— দু'টিতেই ইউরোবিধির উল্লেখ থাকায়, ইউরোবিধি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড কৌতুহল দেখা দেয়। কিন্তু ইউরোবিধি কি ও কেন— তা নিয়ে তথ্য সহজলভ্য নয়। কেন্দ্রীয় দূষণে নিয়ন্ত্রণ পর্ষদসূত্রে কিছু তথ্য পওয়া যায়। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ ও অপ্রতুল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও

কিছু তথ্য জোগাড় হলো। এছাড়া নানা বইপত্র ও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে যে মোটামুটি ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

ইউরোপের দেশগুলি ধাপে ধাপে এগিয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় তারা একটি "অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর" (European Economic Community বা EEC) স্তর থেকে নিজেদের একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে (European Union বা EU) উন্নীত করেছে। তারা যে শুধু ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ভ্রমণ, পণ্যচলাচল অবাধ করে তুলেছে তাই নয়, অভিন্ন মুদ্রা "ইউরো" প্রচলনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপও মুক্ত ও সহজ করেছে। আন্তঃইউরোপীয় গাড়ীর বাজার ও যাতায়াত অবাধ করার লক্ষ্যে গাড়ী উদ্ভুত বায়ুদূষণ সংগ্রান্ত অভিন্ন বিধিনিয়মও চালু করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এইগুলিই ইউরো বিধি। এখনও পর্যন্ত ইউরো-1 এবং ইউরো-2 বায়ুদূষণ বিধির প্রয়োগ হয়েছে যথাক্রমে 1992 ও 1996 সালে। 2000 সালের জন্য ইউরো-3, 2005 সালের জন্য ইউরো-4 এবং 2008 সালের জন্য ইউরো- 5 চালু হওয়ার অপেক্ষায়।

ইউরো বিধির ভিত্তি হিসাবে আবার চিহ্নিত করা চলে আমেরিকার জাতীয় (যুক্তরাষ্ট্রীয়) বায়ুদূষণ বিধিগুলিকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধিগুলি আবার ক্যালিফোর্নিয়ার এই ধরণের নিয়মের আদলে তৈরী। সারণী 1-এ এ জাতীয় কয়েকটি দূষণ বিধির বিশেষ অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। ইউরো, ইপিত্র (EPA-Environment Protection Agency -আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা) অথবা এ আর বি (ARB-Air Research Board-ক্যালিফর্ণিয়ার বায়ু দূষণ গবেষণা সংস্থা) দূষণবিধিগুলির উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখলে বলা যায় যে এ জাতীয় বায়ুদূষণ বিধিগুলির প্রণয়ন একটি সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলশ্রুতি। বায়ুদূষণ পরিমাপ করা হচ্ছে, জীবন ও পরিবেশের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব নিয়ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। বেশী গাড়ী রাস্তায় নামার অর্থ বেশী দূষণ, যদি না নির্গত গ্যাস ও ধোঁয়ার পরিমাণ কমানো যায়। বেশী গাড়ী না হলে বাজারও জমে না, ব্যবসায় রমরমা ভাব আসে না। সুতরাং বেশী সংখ্যায় গাড়ী কম পরিমাণে দূষণ— এই হল নীতি। ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং জীবন ও পরিবেশের মান অক্ষুন্ন রাখার চাহিদার জটিল সমীকরণের সমাধানের মত একের পর এক উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন কৃৎকৌশল, নবতর প্রযুক্তি ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের মত দেশগুলিতে। ডিজেল ইঞ্জিন পেট্রোল ইঞ্জিনের তুলনায় দামী হলেও, ডিজেল সহজলভ্য ও সস্তা। ডিজেল ইঞ্জিন জনপ্রিয় এবং কার্যকারিতাও (efficiency)বেশী। কিন্তু মুস্কিল হলো এ থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং কণাদূষণ বেশী হয়। গবেষণায় তাই বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনের হানিকর দূষণকে কমিয়ে আনায়। এই নিবিড় গবেষণার ফলশ্রুতির সামান্য উল্লেখ এখানে রাখা হলো (বক্স দ্রষ্টব্য)। ইউরো, ইপিএ বা এ আর বি'র মত উন্নত দূষণ বিধিগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে গাড়ীর উৎপাদক সংস্থাকে এই মর্মে শংসিত করতে হবে যে সংস্থা-নির্মিত গাড়ী পুরো আয়ুষ্কালে প্রযোজ্য দূষণবিধি মেনে চলবে। গাড়ীর ইঞ্জিনের ডিজাইন, গ্যাস-ধোঁয়ার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা, গাড়ীতে ব্যবহৃত জ্বালানী— প্রভৃতি প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা এমনটিই সুনিশ্চিত করবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি এত সতর্কতার সংগে প্রণীত যে গ্যাস-ধোঁয়া কমানোর নানান যন্ত্রপাতির আয়ুও যাতে গাড়ীর আয়ুর সংগে সংগতিপূর্ণ হয়—সেই আশ্বাস ও গ্যারান্টির সংস্থানও বিধিগুলিতে স্থান পেয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যায়, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, গাড়ী-উৎপাদক সংস্থা, বায়ু দূষণ বিধিপ্রণেতা, পরিকাঠামো নির্মাতা, জ্বালানী তেল প্রস্তুতকারক সকলে মিলে সার্বিক বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সমান যত্নশীল। ফলে প্রণীত বিধিগুলি বলবৎযোগ্য হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে ভবিষ্যতেও হবে। পরবর্ত্তী ধাপের দূষণবিধি কার্যকরী করার আগে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ বা কারিগরী উদ্ভাবন ঠিকমত হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার সংস্থান আছে।

ভারত-বিধি বনাম ইউরো বিধি

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণের প্রকোপ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে কেন? দিল্লী এলাকারজন্য সুপ্রীম কোর্ট এবং কলকাতার জন্য রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন কেন? 1986 তে প্রণীত পরিবেশ (সুরক্ষা) বিধিনিয়ম অনুযায়ী চালু মোটরগাড়ীর দূষণ পরীক্ষা করিয়ে 6 মাস অন্তর "দূষণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে" (Pollution under Control) সার্টিফিকেট নেবার কথা। তা কি ঠিকঠাক পালিত হচ্ছে না? এব্যাপারে কারচুপি-দুর্নীতি যে ব্যাপক তা সংবাদপত্রেই বহুবার বিশদে প্রকাশিত হয়েছে। আবার ঐ 1986 'র বিধিনিয়ম অনুযায়ীই গাড়ী উৎপাদকদের 1991-1992 থেকে প্রতিটি গাড়ী বাজারজাত করার সময়ে যে নির্দিষ্ট পন্থাপদ্ধতি মেনে পরীক্ষা করে দূষণ-সার্টিফিকেট দেবার কথা (বক্স দ্রঃ),তাও কি পালিত হচ্ছে? শুধু তাই নয়, 1991-এর পর আরও কয়েক ধাপে উৎপাদনস্তরে

(Ex-factory) গাড়ীর দূষণের উর্দ্ধসীমাকে নামিয়ে আনা হয়েছে,আরও কমাতে গেলে তা ইউরোবিধির সঙ্গে তুলনীয় হবে, অতএব ইউরোবিধিই মেনে নেওয়া যায়! এরকমই যেন বলতে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই কাগজপত্রে তৈরী হলেও, সামাজিক স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি থাকায় চালু নিয়মকে নিময়রক্ষক এবং ব্যবহারকারী বুড়ো আঙুল দেখায়। আবার বিধিনিয়মে কিছু অসংগতি ও ফাঁক থাকলে সবাই চেষ্টা করে সেগুলির চূড়ান্ত সুযোগ নিতে! ফলে বায়ু দূষণের গোটা ক্ষেত্রটাই

ইউরোপ ও আমেরিকায় গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়ার দূষণ রোধে প্রযুক্তিগত কিছু ব্যবস্থা ও উদ্ভাবন

- **ইঞ্জিনের ডিজাইনের রূপান্তর/ সংযোজন—**
  Multi-fuel Injection System
- **গাড়ী-নির্গত গ্যাস-ধোঁয়ার ট্রিটমেন্ট—**
  Catalytic converter; Dual converter; Particulate Traps (মিহি কণাপদার্থ আটকানোর জন্য); Advanced Emission After Treatment Device (catalyst); $DeNO_x$-Catalyst (নাইট্রোজেনের অক্সাইডকে নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত করার জন্য);
- **জ্বালানীর রূপান্তর/ বিকল্প—**
  Low sulphur gasoline (300 ppm সালফার-সমন্বিত ও লাইট ডিজেল গাড়ীর উপযোগী, যাতে ইপিএ স্তর-2 বায়ুদূষণ বিধি মানা চলে); Ultra low sulphur gasoline (চলতি সালফারের মাত্রা 500 ppm থেকে পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে 50,30,10 এমনকি 5 ppm করার চেষ্টা চলেছে); Compressed Natural Gas(CNG);
- **দূষণের পরিমাপ—**
  European Stationary Cycle, ESC এবং European Transient Cycle, ETC (ইউরো-3-এ কঠোর শর্তসাপেক্ষ দ্বিস্তরীয় দূষণ মাপার ব্যবস্থা); Special Federal Test Procedure, SFTP (ইপিএ স্তর -2 বিধিতে হাইওয়ে দিয়ে দুরন্ত গতিতে চলার সময় বায়ুদূষণ মাপার ব্যবস্থা); On-Board Diagnostic System, OBD (ইউরো-4 বিধিতে হেভি ডিউটি গাড়ীগুলির চলার সময়ে দূষণ পরিমাপের ব্যবস্থা)।

সীমাবদ্ধ, প্রায়োগিক বাস্তবতা এ থেকে বহু দূরে! উৎপাদন কিংবা ব্যাবহার কোন স্তরেই মোটরগাড়ী থেকে দূষণ কমানোর কোন ব্যবস্থাই কার্যত নেওয়া হয়নি।

গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়ার দূষণজনিত চিত্রটা ইউরোপ-আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশে অনেকটাই আলাদা। ঐ দেশগুলিতে বায়ুদূষণের সংগে গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়ার দূষণের পরিমাণের সম্বন্ধটা পরিস্কার কার্য-কারণের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু একটি বিশেষ বায়ু-দূষণ বিধি মেনে তৈরী কোন গাড়ী তার আয়ুষ্কালের নির্দিষ্ট কোন সময়ে কতটা দূষণ ঘটাচ্ছে, তা পূর্ব-নির্ধারিত এবং সামগ্রিকভাবে আইনশৃঙ্খলা মেনে চলার পরিমণ্ডলটি সুষ্ঠু, তাই সার্বিক বায়ুদূষণের ব্যাপারটাও নিয়ন্ত্রিত। বায়ুর দূষণের পরিমাণ আরও হ্রাস করার তাগিদে ও আরও গাড়ী রাস্তায় নামানোর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, দূষণ বিধিগুলি ক্রমশ কঠোর করা হচ্ছে, পাশাপাশি প্রযুক্তির চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করে প্রায় দূষণহীন গাড়ী তৈরীর লক্ষ্যে নেওয়া হচ্ছে পরিকল্পনা। দূষণ পরীক্ষার পদ্ধতিও পাল্টাচ্ছে।

আর আমাদের দেশে? অনেক অসংগতি নিয়ে বায়ু-নিয়ম ভীষণ অনিয়ন্ত্রিত, ভয়াবহ ও অবহেলাদীর্ণ। এই অবস্থায়, আমাদের দেশে ইউরোবিধি লাগু করার অর্থ কতকগুলি অনিবার্য বাস্তব অবস্থার মুখোমুখী হওয়া। ইউরো, ইপিএ বা এআরবি বায়ুদূষণ বিধিগুলি পরিকল্পিত হয়েছে এবং সেগুলিকে কার্যকরী করে তোলার পিছনে কারিগরী উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া যথেষ্টই হয়েছে এবং হচ্ছেও। স্বভাবতই এগুলির পেটেন্ট (patent) নেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইউরোবিধিগুলি প্রচলন করার অর্থ, পেটেন্টেড্ পদ্ধতি (process) বা দ্রব্যকে (product) কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত গাড়ীর মার্কেটিং-এর জন্য আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ গাড়ী কোম্পানীর Exclusive Marketing Right (EMR) পাওয়া বা দেওয়া। এ ব্যাপারে নতুন বিশ্ব বাণিজ্য নীতির পূর্ণ সহায়তা নেওয়া হবে এবং এই উপযোগী ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা আমাদের নীতি-নির্ধারকদের পক্ষ্যে বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা হবে। গাড়ী উৎপাদনের ক্ষেত্রে তো বটেই, একই ঘটনা ঘটবে জ্বালানী উৎপাদনের ক্ষেত্রে,পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে। ইউরোপ-আমেরিকায় উন্নততর বায়ুদূষণ বিধি মেনে-চলা গাড়ী কেনার জন্য কর ছাড়ের ব্যবস্থা থাকে; আমাদের

এখানেও নিশ্চয় তা ঘটবে। শিল্প কারখানার স্থাপন বা কারিগরী আমদানীর ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়াই চলছে, একটু অন্যভাবে!

ফিরে আসা যাক্ পশ্চিমবঙ্গের প্রসংগে। 4ঠা জুনের ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, সরকার সবদিক খুঁটিয়ে বিচার না করেই একটি দায়সারা, গতানুগতিক এবং খণ্ডিত (piece-meal) বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। CMA- তে ইউরো মানা গাড়ী চালু হলেও, রাজ্যের বা দেশের অনত্র বাধা থাকবে না পুরনো গাড়ী চলায়। ইতিমধ্যেই পুরনো গাড়ীর দাম অনেক কমে গেছে, বিক্রী হয়ে চলে যাচ্ছে মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে। এই প্রবণতা আপাতত আরও বাড়বে। সামগ্রিকভাবে বায়ুদূষণ এতে মোটেই কমছে না। ইউরোপ-আমেরিকায় কিন্তু সামগ্রিকভাবেই দূষণ বিধি চালু হয়েছে— পরিকল্পিত পর্যায়ক্রমে (phased manner) উৎপাদনকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা থাকছে 100 শতাংশ বিধি মেনে চলা গাড়ীতে!.... সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সবাইকে ছেড়ে যেন শুধু ট্যাক্সিকেই ধরা হলো। 15 বছরের ট্যাক্সি জীবনের বিধি কিন্তু আগেই চালু হওয়ার কথা! চালু গাড়ীর দূষণ মাপার নতুন যে মাত্রার কথা বলা হলো, তাও '90 থেকে চালু বিধিবদ্ধ মাত্রাই! নতুন গাড়ীর ক্ষেত্রে দেশের মোটরগাড়ী উৎপাদক সংস্থারা জ্বালানী বা কারিগরীর উন্নতির জন্য কি ভাবে কি করতে পারেন বা দেশীয় গবেষণা তাদের কোন সাহায্য করতে পারে কিনা তার কোন কথার কণামাত্র উল্লেখ নেই সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে। উল্টো দিকে, ইউরো বা ইপিএ বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ডিজেল চালিত গাড়ীর দূষণকে সামগ্রিক বায়ুদূষণের পক্ষে সর্বাধিক অবদানকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের সহায়তায় পেট্রোল ও ডিজেল গাড়ীর দূষণকে একই মাত্রায় নামিয়ে আনা। আমেরিকার তৈল শোধনাগারগুলি আগে থেকেই খুব ভালভাবে জানে 10 বছর পরে তাকে কি মানের জ্বালানী সরবরাহ করতে হবে;নিবিড় গবেষণার ভিত্তিতে তাই তারা আশ্বাস দেয় পেট্রোলের সালফার-কে বর্তমানের 300 পিপিএম মাত্রা থেকে 2004 সালে 30 পিপিএম মাত্রায় নামিয়ে আনার! পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ঘোষণায় শুধু বলা হলো লেড-মুক্ত জ্বালানী, বা কম গন্ধকযুক্ত জ্বালানী বা বিকল্প জ্বালানীর (Compressed Natural Gas) জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী জানানো হচ্ছে! দেখে শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক বিদেশী নতুন কারিগরীর গাড়ী আমদানী বা তৈরীর পথ প্রশস্ত করাই যেন লক্ষ্য। আদেশের ফলে ট্যাক্সিমালিকদের ক্ষেপে ওঠা অনিবার্য ছিল।

মোটর গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়ার মান-নির্ধারক ভারতীয় বায়ু-দূষণ বিধির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- 1 মার্চ, 1990 থেকে 4 চাকার পেট্রোল চালিত গাড়ীর কার্বন মনোক্সাইডের (আইডিলিং অবস্থায়) মাত্রা হবে সর্বোচ্চ 3 আয়তন শতাংশ এবং 2 ও 3 চাকার গাড়ীর ক্ষেত্রে তা হবে 4.5 আয়তন শতাংশ। ডিজেল গাড়ীর ধোঁয়ার ঘনত্ব হবে 65 Hartridge একক (পূর্ণত্বরণে) বা 75 Hartridge একক (উৎপাদক সংস্থা কর্তৃক ব্যক্ত উর্দ্ধতম গতির 60-70% গতিতে)
- 1 লা এপ্রিল, 1991 থেকে গাড়ীর উৎপাদক সংস্থাকে এই মর্মে শংসিত করতে হবে যে সংস্থা-নির্মিত গাড়ী চালু বায়ুদূষণ নিয়ম মেনেই তৈরী; গাড়ী নির্মাণ সংস্থাকে আরও শংসিত করতে হবে যে গ্যাস-ধোঁয়ার বর্জনের জন্য দায়ী যন্ত্রপাতি এমনইভাবে পরিকল্পিত (designed), তৈরী (constructed) ও গ্রথিত (assembled), যাতে স্বাভাবিক অবস্থায় গাড়ী বায়ুদূষণ বিধি মেনে চলে (সারণী -1 দ্রষ্টব্য)।
- পুলিশের সাব-ইন্স্পেক্টর বা অধিক পদমর্যাদার কোন অফিসার বা মোটর ভেহিক্যাল বিভাগের কোন ইন্স্পেক্টর গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়া পরীক্ষার আদেশ দিতে পারেন। গাড়ীর চালক বা ব্যবহারকারী সেক্ষেত্রে গাড়ীটিকে পরীক্ষার জন্য দিতে বাধ্য।
- গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়ার পরীক্ষা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে করা যাবে।

সুপ্রীম কোর্ট আদেশদানের সংগে এও বলেছিলেন যে গাড়ীর উৎপাদক সংস্থা বা কারুর কোন বক্তব্য থাকলে তারা ভুরে লাল কমিটির কাছে জানাতে পারে। মাননীয় কোর্ট জুলাই-এর শেষে আবার আদেশ-পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা করারও আশ্বাস দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহলে আনুসঙ্গিক বিষয়গুলির সবদিক না ভেবে, জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষাটুকুও না করে তড়িঘড়ি এমন ঘোষণা কেন করলেন? যে মন্ত্রী, রাজনীতিকরা শব্দদূষণের হাইকোর্ট নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মানতে প্রকাশ্যেই বিরোধিতা করেন, বহুতল বাড়ীর নির্মাণ এবং তথাকথিত উন্নয়নের জন্য জলাজমি ভরাট করতে উৎসাহ দেন, যাঁরা বলেন পরিবেশ

পরিবেশ করে এত সব কিছু মানতে হলে উন্নয়ন অসম্ভব, যাঁরা হকার উচ্ছেদ করে কলকাতায় যানের গতি বাড়িয়ে, উচ্ছেদ-হওয়া বেকার হকারদের ছোট গাড়ী চালাবার পরামর্শ দেন, তাঁরা যে পরিবেশের জন্য কাতর হয়ে এমন ঘোষণা করেছেন, তা মেনে নেওয়া সত্যিই শক্ত!

দেয়াল লিখন ?

এবং দেওয়াল-লিখন পরিষ্কার— উন্নত বিদেশী কারিগরীর কম দূষণের গাড়ীই ভারতীয় বাজার দখল করবে। সাময়িক হাত-পা ছোঁড়া একটু আধটু হলেও, সবাইকে তা মানতে বাধ্য হতে হবে। কেননা ইউরোপ আমেরিকার ভাবনায় পৃথিবীর কোথাও বায়ুদূষণের প্রকোপ চলতে দেওয়া যায় না। তারা নিজেরা যদি তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, অপর সব দেশকেও, বিশেষত ভারতের মত 'উন্নয়নকামী' ও বিশাল বাজারের দেশকেও তা মানতে হবে। বায়ুদূষণের প্রভাব শেষ বিচারে, আন্তঃরাষ্ট্রীয়। তাই এখন পুরনো গাড়ী গ্রামেগঞ্জে চললেও, তাদেরও রেহাই মিলবে না।... আমরা তো গ্লোবালাইজেশনের নামে এই নীতিই মেনে নিয়েছি। কাজেই দুঃখ পেলেও, আমাদের অনুসন্ধানের এটাই অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

সারণী -1: ক) মোটর গাড়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইউরোবিধির কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়	বিধি	গোত্র ও প্রয়োগকাল	টেষ্ট - সাইকেল	বিভিন্ন বায়ু দূষকের (Pollutants) মাত্রা									
				CO		HC		NO_x		RSPM		$CO+NO_x$	ধোঁয়া
				g/km	g/kwh	g/km	g/kwh	g/km	g/kwh	g/km	g/kwh	g/km	/m
প্রধানত চালু বায়ু দূষণ বিধিগুলির ভিত্তিতে 1991 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মন্ত্রীপরিষদ "Consolidated Emission Direction 91/441/EEC" শীর্ষক একগুচ্ছ নিয়মের ব্যবস্থা করেন, যা ইউরো-1 নামে খ্যাত। 1996 সাল থেকে লাগু হওয়ার জন্য 1994 -এ পাস হয় কঠোরতর নিয়মাবলী 94/12/EEC বা ইউরো-2 বিধি। 1998 -এর ডিসেম্বরে ইউরোপীয় মন্ত্রী পরিষদ বায়ুদূষণ বিধি সংশোধনী 88/77/EEC বা ইউরো-3 গ্রহণ করেছেন 2000 সাল থেকে চালু করার জন্য। গৃহীত হয়েছে ইউরো-4 ও ইউরো-5 বিধিগুলি যথাক্রমে 2005 ও 2008 সালে লাগু হওয়ার জন্য। আশা করা হচ্ছে শেষোক্ত বিধিত্রয় 1999 সালেই ইউরোপীয় সংসদের অনুমোদন পাবে।	ইউরো-1	পেট্রোলচালিত প্যাসেঞ্জার গাড়ী; 1992	ECR R-49	2.72	–	–	–	–	–	–	–	0.97	–
	ইউরো-2	ঐ	ঐ	2.20	–	–	–	–	–	–	–	0.57	–
	ইউরো-3	ঐ	ESC + ETC	2.30	–	0.20	–	0.15	–	–	–	–	–
	ইউরো-1	ডিজেলচালিত হেভী ডিউটি ইঞ্জিন, >0, 85kw;1992	ECR R-49	–	4.5	–	1.1	–	8.0	–	0.36	–	–
	ইউরো-2	ঐ	ঐ	–	4.0	–	1.1	–	7.0	–	0.25	–	–
	ইউরো-3	EEV; 2000	ESC+ ETC+ ELR	–	1.5	–	0.25	–	2.0	–	0.02	–	0.15

CO= কার্বন মনোক্সাইড; HC= হাইড্রোকার্বন; NO_x= নাইট্রোজেনের অক্সাইড; RSPM= শ্বাসযোগ্য মিহি ধূলিকণা, Steady State Engine Test Cycle -এর কোড্ = ECR R-49; ইউরোপীয় স্টেশনারী সাইকেল =ESC; ইউরোপীয় ট্রান্জিয়েন্ট সাইকেল = ESC; এন্হান্স্ড এন্ভায়রন্মেন্টালি ফ্রেণ্ডলী ভেহিক্যাল EEV; ইউরোপীয় লোড্ রেস্পন্স্ টেস্ট = ELR (এই পরীক্ষার সাহায্যে ধোঁয়ার অস্বচ্ছতা বা opacity মাপা হয়)।

সারণী 1 : খ) আমেরিকার ইপিএ (EPA) বিধির কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়	বিধি	গোত্র ও প্রয়োগকাল	টেষ্ট-সাইকেল	বিভিন্ন বায়ু দূষকের মাত্রা (g/mile)							
				THC	NMHC	CO	NO_x		PM	NMOG	HCHO
							ডিজেল	পেট্রোল			
দ্বিস্তরীয় বায়ুদূষণ বিধির প্রণেতা আমেরিকার এন্‌ভায়রন্‌মেন্ট প্রোটেকশন্ এজেন্সি (ইপিএ)-এর আইনী সংস্থান যুক্তরাষ্ট্রের "ক্লিন এয়ার অ্যাক্টস্ সংশোধনী, 1990 "-এ; প্রথম স্তরের (ইপিএ-1) বিধিগুলি 1991 সালে প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসে পেশের জন্য 1998 সালে দ্বিতীয় স্তরের (ইপিএ-2 বিধিগুলি প্রণীত হয়। এদের লাগু হওয়ার কথা 2004 সালে। দুটি স্তরের বিধি চালু থাকার মাঝামাঝি সময়ে এন.এল.ই.ভি. (ন্যাশনাল লো এমিশন্ ভেহিক্যাল) নামে এক সাময়িক বায়ুদূষণ বিধির ব্যবস্থা থাকছে আমেরিকায়। দ্বিতীয় স্তরের বিধিগুলিতে সাতটি পর্যায় (bin) আছে এবং একই দুষণবিধি ডিজেল/ পেট্রোল/বৈকল্পিক জ্বালানী চালিত যেকোন প্রকার গাড়ীর গ্যাস ধোঁয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	ইপিএ-1	প্যাসেঞ্জার গাড়ী আয়ুস্কাল50,000 মাইল। 5 বছর; 1994-1997	FTP-75	0.40	0.25	3.40	1.00	0.40	0.08	–	–
	ইপিএ-1	লাইট ডিউটি ট্রাক, আয়ুস্কাল 1,00,000 মাইল বা 10 বছর; 1994-1997	ঐ	0.80	0.40	5.50	0.97	0.97	0.10	–	–
	ইপিএ-2 বিন্-7	যে কোন গাড়ী আয়ুস্কাল 1,20,000 মাইল বা 12 বছর; 2004 তদুর্দ্ধ	ঐ	–	–	4.20	0.20	0.20	0.02	0.125	0.018
	ইপিএ-2 বিন্-4	ঐ	ঐ	–	–	2.10	0.07	0.07	0.01	0.055	0.011
	ইপিএ-2 বিন্-2	ঐ	ঐ	–	–	2.10	0.02	0.02	0.01	0.01	0.004
	ইপিএ-2 বিন্-1	ঐ	ঐ	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

THC = মোট হাইড্রোকার্বন; NMHC= মিথেনহীন হাইড্রোকার্বন; CO = কার্বন মনোক্সাইড; NO_x= নাইট্রেজেনের অক্সাইড; PM = কণাপদার্থ; FTP = ফেডারেল টেস্ট প্রোসিডিউর; NMOG = মিথেনহীন জৈব গ্যাস সমুহ; HCHO = ফরম্যাল্‌ডিহাইড

সারণী 1 : গ) ক্যালিফোর্নিয়ার (ARB) বিধির অংশবিশেষ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়	বিধি	গোত্র এবং প্রয়োগকাল	টেষ্ট সাইকেল	বিভিন্ন বায়ু দূষকের মাত্রা				
				NMOG	CO	NO_x	PM	HCHO
				g/mil	g/mil	g/mil	g/mil	g/mil
ক্যালিফর্নিয়ার এয়ার রিসার্চ বোর্ড (এআরবি) গ্যাস-ধোঁয়ার গুণগত মানের ভিত্তিতে কয়েক ধরণের দূষণ বিধির প্রচলন করে। যেমন, স্তর- 1	স্তর-1	প্যাসেঞ্জার গাড়ী আয়ুস্কাল50,000 মাইল/5 বছর বর্তমানে প্রচলিত	FTP-75	0.25	3.40	0.40	0.08	
Transilional Low Emission Vehicle (TLEV), Low Emission Vehicle (LEV) , Ultra Low Emission Velicle (ULEV), Super Ultra Low Emission Vehicle (SULEV) এবং Zero Emission Vehicle; সেখানে গাড়ীর নির্মাতাদের ক্রমশ কঠোরতর দূষণমাত্রা মানে এমন গাড়ী তৈরী করতে হয়; সেটা সংস্থার মোট উৎপাদনের কতশতাংশ হারে, তাও নির্দিষ্ট আছে। বর্তমানেএই বিধিগুলি চালু এবং স্তর-1/ TLEV বিধি 2003 পর্যন্ত কার্যকরী থাকছে। 2004 সালে থেকে চালু হচ্ছে "LEV-II" নামে আরও কঠোর দূষণ বিধি সমূহ। পেট্রোল এবং ডিজেল দু'ধরণের গাড়ীর জন্য একই বিধি প্রযোজ্য।	ULEV	ঐ	ঐ	0.04	1.70	0.20	–	0.008
	LEV-II	ঐ 2004 তদুর্দ্ধ	অনুল্লেখিত	0.075	3.40	0.05	–	0.015
	স্তর-1	মিডিয়াম ডিউটি ভেহিক্যাল, GVWR 10,001 থেকে 14,000 পর্যন্ত, আয়ুস্কাল 12,000মাইল/ 11 বছর; বর্তমানে প্রচলিত	FTP-75	0.60	7.00	2.00	–	–
	ULEV	ঐ	ঐ	0.69	3.50	0.50	–	0.009
	LEV-II	ঐ 2000তদুর্দ্ধ	ঐ	0.167	7.30	0.40	0.06	0.021

গ্রস্ ভেহিক্যাল ওয়েট রেটিং = GVWR (গাড়ীর ওজন + কার্গোর ওজন)

সারণী 1 : ঘ) ভারতীয় বিধির প্রাসঙ্গিক অংশ (Ex-Factory গাড়ীর দূষণের উচ্চসীমা)

সংক্ষিপ্ত পরিচয়	বিধি	গোত্র এবং প্রয়োগকাল	টেষ্ট সাইকেল	বিভিন্ন বায়ু দূষকের মাত্রা					
				CO		HC		NO_x	
				g/km	g/kwh	g/km	g/kwh	gkm	g/kwh
ভারতবর্ষে 1986 সালে এন্‌ভারন্‌মেন্ট (প্রোটেকশান্‌) অ্যাক্ট প্রণীত হয়। এই আইনের রুল 3 -এর সিডিউল IV -এ বিবৃত হয় গাড়ীর গ্যাস-ধোঁয়া জনিত বায়ু-দূষণ বিধি "Standards for emission of smoke, vapour etc. from motor vehicles'; বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার যে বায়ুদূষণ বিধি চালু করেছেন, তা এই কেন্দ্রীয় বিধির আদলে তৈরী।	ভারতীয় বায়ুদূষণ বিধি(মোটর ভেহিক্যাল)	পেট্রোলের 2 ও 3 চাকার গাড়ী; R > 150 kg; 01.04.91তদূর্দ্ধ	ভারতীয় ড্রাইভিং সাইকেল	12.0	–	8.0	–	–	–
	ঐ	ঐ R ≤ 150 kg; 01.04.91তদূর্দ্ধ	ঐ	30.0	–	12.0	–	–	–
	ঐ	পেট্রোলের লাইট ডিউটি ভেহিক্যাল। R≤ 2150 kg 01.04.91 তদূর্দ্ধ	ঐ	27.1	–	2.9	–	–	–
	ঐ	ডিজেলের সব ধরণের গাড়ী 01.04.92 তদূর্দ্ধ	ঐ	–	14.0	–	3.5	–	18.0

R = রেফারেন্স মাস; দূষণের মাত্রা পরিমাপ করা হয় ভারতীয় ড্রাইভিং সাইকেল অনুযায়ী 'চেসিস ডায়নামো-মিটার (Chasis dynamometer) পদ্ধতি দ্বারা। রেফারেন্স জ্বালানীর বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড স্পেসিফিকেশন্‌ অনুযায়ী নির্ধারিত।

গাড়ীর ধোঁয়ায় শরীর -স্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হয়
চিন্তিত হয়ে পড়লেন মন্ত্রী মহোদয়!
বায়ুদূষণ নিবারণে আজ্ঞা করেন জারি
ধোঁয়ার প্রকোপ কমাতে হলে ইউরো দরকারী।
ইউরোপীয় দূষণবিধির সর্ববিধ গুণ
চলবে গাড়ী, ঘটবে না আর কালো ধোঁয়ার ধূম;
ঝরঝরে সব বাস-ট্যাক্সির দিন যে হল শেষ
বাঁচবে বায়ু, বাঁচবে জীবন, বাঁচবে পরিবেশ।
দূষণ-হরা নিয়ম মাঝে স্বার্থহানির গন্ধ!

ইউরো নিয়ম চালুর কথায় বাস-ট্যাক্সি বন্ধ!
ধমকি খেয়ে ঘাব্‌ড়ে গিয়ে তাবড় মন্ত্রী কইল—
ইউরো বিধির চালুর ব্যাপার মূলতুবী যে রইল।
কেনই বা এই এগিয়ে যাওয়া, কেন পিছিয়ে আসা,
ব্যাপারখানার মাঝে কেমন দুষ্টু ঘুঘুর বাসা!
জলজঙ্গল সাফ হয়ে যায় উন্নয়নের নামে,
তুলতে হুকার মোড়ের মাথায় সেপাই -ক্যাডার ঘামে।
দেশের কাজে নেমে যারা খাবার সময় পান না
পরিবেশের তরে তাদের একি মায়া কান্না?

ওমপ্রকাশ

তৃতীয় পর্ব

বিষয় : পরিবেশ

পরিবেশ কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; মানুষের জীবন-জীবিকায় সম্পৃক্ত হয়ে আছে পরিবেশ। পরিবেশের বিপন্নতা তাই মানুষেরই বিপন্নতা। বিজ্ঞান কারিগরির অপপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ পরিবেশ-বিপন্নতার অন্যতম প্রধান কারণ। আর সেই বিপন্নতা থেকে মুক্তি পেতে আমরা আবার বিজ্ঞান কারিগরিরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু পরিবেশমুখী একটি স্বাভাবিক, বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সভ্যতার কর্মকাণ্ড প্রসারিত করতে না পারলে পরিবেশজনিত বিপন্নতা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মধ্যেও থাকা চাই তেমনই এক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধানের প্রয়াস—বিষয় : পরিবেশ।

যে কেউ এ বিভাগের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। মতামত, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর খবরাখবর, টীকা-সমীক্ষাদিও প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে। — সঃ মঃ

পরিবেশ আইন-কানুন : নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

(ছয়)

বেদনায় কাটে প্রতিদিন পলে পলে হই জেরবার
মাটি ও আকাশ সাথী আমাদের দুখি পরিবার।

সূর্য ভোলেনি তবু রোজ ভোরে দেয় রাঙা টিপ
আঁধার ঘনিয়ে এলে জ্বলে ওঠে দেওয়ালির দীপ।
এখনও ঋতুরা আসে টলোমলো বেসামাল তালে
এখনও পাখির ঝাঁক দোল খায় পাতার আড়ালে।
নিজেকে সাজাই আমি ডুরে শাড়ি ফলসার পাড়
বৈঁচির মালা গাঁথি দুল পরি ঝুমকোলতার;
ঘাসফুল নাকছাবি মেঘ-ওড়নায় ঢাকি
বাস মাখি রজনীগন্ধার।
মৌমাছি প্রজাপতি অনায়াস দ্রুতগতি।
করে যায় পরাগ সঞ্চার।

বৃথা সাজ আয়োজন সমাবেশ গুঞ্জন।
অনাহত এ রূপ বৈভব।
কোথা সেই কলতান মুগ্ধতা অভিমান
শিশুরা কি হারালো শৈশব!

পরিবেশের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যক্তিনাগরিক কিছু আচরণবিধি মেনে চলার চেষ্টা করতে পারেন, কিছু অভ্যাস ছাড়তেও কিছু গড়ে তুলতে পারেন, কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। এর বাইরেও একক বা দলবদ্ধ ভাবে উদ্যোগী হবার প্রয়োজন হতেই পারে। সংবিধান নির্দেশিত কর্তব্য—পরিবেশ সুরক্ষা—পালনে আইন কতটা সহায় ভারতীয় নাগরিকের? পরিবেশ আইনকানুনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিক্রমার শেষে সেটা একটু পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

প্রাথমিক ভাবে দুটি মাত্র বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক ঃ পরিবেশ আইন কানুন নাগরিকদের *তথ্য জানার* জন্য কি ব্যবস্থা রেখেছে এবং প্রয়োজনে তাঁরা কি অভিযোগ জানাতে, বিচার চাইতে, *আদালতে যেতে পারেন?*

বিশেষজ্ঞতার ঘেরাটোপে আইন ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা নিরন্তর হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সেগুলি অনধিগম্য। বর্তমান পর্যালোচনা নিতান্তই একজন অবিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে দেখার প্রয়াস।

তথ্য জানবার অধিকার

(1) কিছু কিছু শিল্পকারখানায় কোনো বড়ো ধরণের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকলে শিল্প কর্তৃপক্ষ (Occupier) সরাসরি বা আপৎকালীন কর্তৃপক্ষের (District Emergency Authority) মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনাজনিত বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং সেইসঙ্গে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির কথাও জানাবেন। দুর্ঘটনা ঘটলে কি কি করা উচিত বা কি কি করা উচিত নয়, তাও জানাতে হবে। পরিবেশ আইনের অধীনে ঘোষিত 'বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের শিল্পোৎপাদন, মজুত ও আমদানী সংক্রান্ত বিধিনিয়মের (1989)' 15নং রুলে উপরি উক্ত সংস্থান আছে।

সংশোধিত কারখানা আইনেও (1987) অনুরূপ সংস্থান আছে— বিপজ্জনক প্রক্রিয়া নির্ভর ফ্যাক্টরীর ভেতরে ও বাইরে কি ধরণের বিপদ হতে পারে এবং সেগুলির মোকাবিলায় কি ধরণের সাবধানতা ও পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সেসব তথ্য ভেতরের ও আশপাশের এলাকার মানুষজনকে ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো বাধ্যতামূলক। কারখানার বর্জ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও ব্যবস্থা-গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যও জানাতে হবে। কারখানার ভেতরে উপযুক্ত স্থানে অধিকাংশ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় এইসব তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। স্থানীয় মানুষের মধ্যেও প্রচার করতে হবে। চিফ ইনস্পেক্টর (অফ ফ্যাক্টরিজ) এবং স্থানীয় সরকারী বা স্বায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষকেও এসব তথ্য জানাতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি-পদ্ধতির বিশদ তথ্যও জানাতে হবে। (Compulsory Disclosure of Informations– 41Bধারা)।

এক হিসেবে পরিবেশ সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের এই দুটি সংস্থানকে কোন দুর্ঘটনা বা বিপদ সম্পর্কে নাগরিকদের (ও শ্রমিক-কর্মীদের) আগাম তথ্য জানার অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করা যায়। ভূপাল পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই ধারাগুলি এসেছে। আগে প্রণীত জল ও বায়ু আইনে এধরণের কোন সংস্থান নেই। এমনকি ভূপাল পরবর্তী মূল পরিবেশ আইন বা পরিবেশ (সুরক্ষা) বিধিনিয়মেও (1986) এই সংস্থান স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি।

একটু খতিয়ে দেখলেই এইসব আইনী সংস্থানের অসারতা ধরা পড়ে। প্রথমত, পরিবেশ আইনের অধীনে, 'বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের....' বিধিনিয়মের 15 নং রুল প্রয়োগের জন্য শিল্পসংস্থা চিহ্নিত করণের ভিত্তি হলো *বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ*। বিষাক্ত, বিক্রিয়াপ্রবণ ও বিস্ফোরক এরকম 179 টি রাসায়নিক পদার্থ নামে নামে চিহ্নিত। এছাড়াও আছে নাম না করা দাহ্যবস্তু। এই সব *বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের* নির্ধারিত ন্যূনতম বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ নিয়ে কাজকর্মে যারা লিপ্ত এই নিয়ম প্রযোজ্য তাদের ক্ষেত্রে। আর কারখানা আইনের সংস্থান (41B ধারা) প্রযোজ্য *'বিপজ্জনক প্রক্রিয়ানির্ভর ফ্যাক্টরীর'* ক্ষেত্রে। *বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার* সংজ্ঞাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কয়লা প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সিমেন্ট তৈরী, কাগজ তৈরী ইত্যাদি 29 প্রকার বিপজ্জনক প্রক্রিয়ানির্ভর শিল্পও চিহ্নিত করা হয়েছে কারখানা আইনে। ফলে দুটি পৃথক আইনের অনুরূপ সংস্থানের মধ্যে এমন একটা আপাত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে যার নিরসন সহজে হবার নয়। এবং এই দুই-এর সামঞ্জস্য বিধান নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে কে কিভাবে তা নিরসনে উদ্যোগী হবার অধিকারী, তার ও কোন ইঙ্গিত আইনে না থাকায় এটি বাস্তবে এক গভীর ফাটল।

দ্বিতীয়ত, এসব *আগাম তথ্য জানাবার* মূল দায়িত্ব শিল্প কর্তৃপক্ষের উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। বাস্তব কারণেই এ ব্যাপারে তাদের অনীহা থাকা স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত, একথা অনস্বীকার্য যে সমস্ত রকমের সম্ভাব্য বিপদ ও তাদের মোকাবিলার পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে নিখুঁত পূর্বানুমান সর্বদা সম্ভব নয়। তাহলে তো দূষণ-দুর্ঘটনা কখনো ঘটতই না। কিন্তু যতটুকু সম্ভব সেটুকু করার জন্যও যথাযথভাবে শিল্পের আভ্যন্তরীন আপৎকালীন পরিকল্পনা এবং চারপাশের এলাকার জন্য আপৎকালীন পরিকল্পনা (Onsite এবং Offsite Emergency Plan) তৈরী ও রূপায়ণ জরুরী ছিলো। কিন্তু এক্ষেত্রেও আইনী সংস্থান বিভ্রান্তিমূলক। সারণী-5 এ দুটি আইনের আপৎকালীন পরিকল্পনা বিষয়ক সংস্থানের তুলনা করা হলো। দেখা যাচ্ছে যে একই বিষয়ে দুটি আইনের সংস্থান অভিন্ন নয়। কারখানা আইন অনুযায়ী কারখানার মধ্যেকার

সারণী—5

আইন/বিধি	আভ্যন্তরীন আপৎকালীন পরিকল্পনা (Onsite Emergency Plan)	পারিপার্শ্বিক এলাকার জন্য আপৎকালীন পরিকল্পনা (Offsite Emergency Plan)
পরিবেশ আইন/ বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের শিল্পোৎপাদন মজুত ও আমদানী সংক্রান্ত বিধিনিয়ম	দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ঃ কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ চিফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ আগাম তথ্য জানাতে হবে ঃ কারখানার ভেতরে সংশ্লিষ্ট যারা	দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ঃ চিফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ জেলা আপৎকালীন কর্তৃপক্ষ/ জেলা কালেক্টর (শাসক) আগাম তথ্য জানাতে হবে ঃ এলাকার মানুষকে
কারখানা আইন	দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ঃ কারখানা কর্তৃপক্ষ চিফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ আগাম তথ্য জানাতে হবে কারখানার শ্রমিক কর্মী ও বাইরের এলাকার মানুষকে	কিছু বলা হয়নি।

ইমার্জেন্সী প্ল্যানের সব তথ্য শ্রমিক কর্মীদের তো বটেই, বাইরের এলাকার মানুষজনকেও জানাবার কথা বলা হলেও বাইরের এলাকার জন্য কোন ইমার্জেন্সী প্ল্যান করার সংস্থানটুকুও নেই। বিপরীতে পরিবেশ আইন ও তার বিধিনিয়ম অনুযায়ী দুরকম পরিকল্পনা করারই সংস্থান আছে। কিন্তু শুধু বাইরের জন্য এমার্জেন্সী প্ল্যানের তথ্যই এলাকার মানুষকে জানাতে হবে। আভ্যন্তরীন প্ল্যানের তথ্য জানাতে হবে শুধু ভেতরে কিছু সংশ্লিষ্ট মানুষকে! গণ্ডগোলটা আরও জটিল রূপ পায় যখন দেখা যায় যে এই দুরকম পরিকল্পনা রচনায় সরকারী যেসব সংস্থা/দপ্তর জড়িত থাকার কথা বলা হয়েছে সেখানে দ্বিত্ব (Duality) ও বৈপরীত্যের উপস্থিতি। আবার যেখানে একাধিক দপ্তরের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানে তারা যে একসঙ্গে করবে এমন কথাও স্পষ্ট করে বলা নেই, কিভাবে সমন্বয় হবে তাও অনুল্লিখিত। জেলা আপৎকালীন কর্তৃপক্ষ তো এখনও অস্তিত্বহীন। আবার, সাধারণভাবে, চিফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজ ও তাঁর দপ্তরই কারখানার ভেতরের কাজকর্ম, নিরাপত্তা ইত্যাদি দেখার জন্য ভারপ্রাপ্ত, চারপাশের পরিবেশের দেখভালের দায়িত্ব দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। অথচ, বাইরের এলাকার জন্য ইমার্জেন্সী প্ল্যান তৈরীতে পরিবেশ আইন দায়িত্ব দিয়েছে চিফ ইন্সপেক্টরকেই। পর্ষদের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই; যদিও আভ্যন্তরীন ইমার্জেন্সী প্ল্যানের বেলায় পর্ষদের নাম চিফ ইন্সপেক্টরের আগে আছে! এসবের নীট ফল যা হতে পারে তা হল দায়িত্ব, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নিয়ে ঠেলাঠেলি রেষারেষি। কাজ হবার কথা নয়, হয়ও নি। পশ্চিমবঙ্গে গুটিকয়েক ব্যতিক্রমী কারখানা নিজেদের উদ্যোগে আভ্যন্তরীণ ইমার্জেন্সী প্ল্যানের মতো কিছু একটা করার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু বাইরের এলাকার জন্য ইমার্জেন্সী প্ল্যানের ব্যাপারে কোন পক্ষ থেকেই কোন উচ্চবাচ্য বিগত দশ বছরে হয়নি, নাগরিকদের তথ্য জানানো তো সুদূরের ব্যাপার!

(2) ফ্যাক্টরী আইনে (বিপজ্জনক প্রক্রিয়ানির্ভর শিল্পে) বর্জ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও ব্যবস্থাগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য কারখানার ভেতরের ও বাইরের মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে জানানোর সংস্থান থাকলেও, পরিবেশ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিনিয়মে (The Hazardous wastes (Handling and Management) Rules 1989) এর উল্লেখমাত্র নেই, যদিও বিপজ্জনক বর্জ্যের বিহিত করা নিয়ে বিশদ বিধি প্রণীত হয়েছে; বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার অনুমোদিত / চিহ্নিত স্থানে বিপজ্জনক বর্জ্য ফেলতে হবে সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সব তথ্য জানাতে হবে।

(3) বায়ু... আইনে বলা হয়েছে যে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে সব ক্ষেত্রে গ্যাসীয় বর্জ্য ছাড়ার অনুমতি দেবে, ছাড়ের মাত্রা ও অন্যান্য সর্তাদি সহ সেগুলির একটি তালিকা পর্ষদের কাছে থাকবে। আগ্রহী বা দূষণে ক্ষতিগস্ত যে কোন ব্যক্তি বা ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে অন্য কেউ পর্ষদের অফিসে ঐ তালিকা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। বায়ু আইনে এই সংস্থান আছে একটি প্রধান

ধারা (51) হিসেবে;জল আইনেও অনুরূপ সংস্থান আছে, তবে একটি উপধারা (25(6)) হিসেবে, কিন্তু পরিবেশ আইনে (বা ফ্যাক্টরী আইনে) এরকম কোন সংস্থান নেই।

(4) পরিবেশ আইনের অধীনে পরিবেশের উপর প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে (Environment Impact Assesment Notification, 1994) শিল্প বা অন্য ধরণের কোন নতুন প্রকল্প বা পুরনো প্রকল্পের সম্প্রসারণ/ অধুনিকীকরণের অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্প এলাকার মানুষজন বা পরিবেশ সংগঠনের মতামত যাচাই-এর কথা বলা হয়েছে। দুটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসভা করে মতামত জানার নির্দেশ আছে এতে। প্রকল্প এলাকার মানুষজনের মতামতের কোনরকম তোয়াক্কা করার আইনী সংস্থান এখানেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর পরে ঐ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে— ছাড়পত্র পাওয়া শিল্প বা প্রকল্পের পরিবেশ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা রিপোর্টের সারাংশ জনসাধারণ দেখতে পারবেন, *জনস্বার্থ বিবেচনা* সাপেক্ষে। অর্থাৎ জনস্বার্থে প্রয়োজন বিবেচিত হলে ঐ রিপোর্টের সারাংশ কাউকে দেখতে দেওয়া যাবে না। এই জনস্বার্থ বিবেচনার কর্তৃত্ব কার বা কোন নিরিখেই বা তা করতে হবে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি নীরব।

(5) উপরের উদাহরণগুলি থেকে এমন মনে করার অবকাশ অতএব থাকছে, যে সাধারণ নাগরিকের দূষণ দুর্ঘটনা সম্পর্কে তথ্য জানবার অধিকার পরিবেশ আইন -কানুনগুলিতে কার্যত স্বীকৃত হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে এমন অধিকার দেওয়া হয়েছে মনে হলেও, এক হাতে তা বাড়িয়ে ধরে অপর হাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু না, অন্তত একটি ক্ষেত্রে বেশ স্পষ্টভাবেই জনসাধারণ তথা নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার স্বীকৃত। বিপজ্জনক পদার্থ বা বর্জ্যবাহী মোটর গাড়ীর সামনে, পিছনে ও গায়ে দৃষ্টিগোচরভাবে বর্ডারঘেরা প্যানেলের মধ্যে, বাহিত পদার্থের পরিচয়, বিপজ্জনক পদার্থের শ্রেণী নির্দেশক চিত্রচিহ্ন, জরুরী যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি জানানোর নিয়ম সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে মোটর ভেহিকিলস বিধিনিয়মে। শুধু এটুকুই নয়। আরও বলা হয়েছে যে বিপজ্জনক বস্তু/ বর্জ্য বাহী মোটর গাড়ীর ড্রাইভারের কেবিনে যে ট্রেমকার্ড (Transport Emergency Card) থাকবে তাতে আপৎকালীন জরুরী পরামর্শ লেখা থাকতে হবে ইংরেজী, হিন্দী এবং যে সমস্ত এলাকা দিয়ে গাড়ীটি যাবার কথা, সেইসব এলাকার আঞ্চলিক ভাষাতে। বাস্তবে যদিও এটুকুও ঠিকভাবে পালিত হয় না, কিন্তু আইন সেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি!

'..... নাকের বদলে নরুন পেলাম...' মনে পড়িয়ে দেয় না?

আদালতে যাবার, অভিযোগ জানাবার, বিচার চাইবার অধিকার

জল আইন, বায়ু আইন, পরিবেশ আইন, বন্যপ্রাণী আইন, অরণ্য আইন—এই সবগুলি আইনই নাগরিকের আদালতে যাবার অধিকার ও পন্থা-প্রকরণ নির্দেশ করেছে। (বিওবি অক্টোঃ—ডিসেঃ, 1997 এবং জানু-মার্চ, 1998 দ্রঃ)। বয়ানমাফিক কিছু তথ্য প্রমাণ সহ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দূষণের বা আইন-লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়ে আদালতে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হবে। রেজিষ্ট্রী ডাকে প্রাপ্তিস্বীকার কার্ড সহ পাঠানো চিঠি সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছনোর অন্তত 60 দিন পরে অভিযোগকারী (গণ) মামলা দায়ের করতে পারেন যদি ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ কোনরকম পদক্ষেপ না নিয়ে থাকেন। এই সংস্থানের উপর ভরসা করে উৎসাহিত হয়ে কোন নাগরিক কি আদালতে যেতে চাইবেন বা পারবেন? মনে হয় না। কারণ—

প্রথমত, 60 দিনের মধ্যে সত্যিকার কোন পদক্ষেপ না নিয়েও শুধু দু-একটি চিঠিচাপাটি লিখেই এহেন নাগরিক উদ্যোগকে আইনসম্মতভাবেই নিবৃত্ত করা যায়। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো শিল্পদূষণের ক্ষেত্রে 60 দিনের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যাওয়া সম্ভব;এমনকি দূষণের চিহ্নাদি লুপ্তও হয়ে যেতে পারে। তৃতীয়ত, এতদসত্বেও কেউ আদালতে পৌঁছে গেলে, তা হতাশাজনকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হতে তো পারেই; তার চেয়েও বড়ো কথা, তথ্য প্রমাণের অভাবে ভরাডুবির সম্ভাবনাও যথেষ্ট প্রবল। কেননা, জল ও বায়ু আইনে বলা হয়েছিলো যে, কেউ দূষণ নিয়ে মামলা করলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সব নথিপত্র(reports) ঐ ব্যক্তিকে দেবেন(shall make available)। (কিন্তু পরবর্তীকালের পরিবেশ আইনে বা জনদায় বিমা আইনে এই সংস্থানের কোন সমর্থন নেই)। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই জল ও বায়ু আইন সর্ত আরোপ করে বলেছে—পর্ষদের বিচারে জনস্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হলে পর্ষদ ঐ সব রিপোর্ট নাও দিতে পারেন। জনস্বার্থ বিবেচনা কোন নিরিখে কিভাবে হবে তার কোন ইঙ্গিতই দেওয়া হয়নি, পর্ষদের নিজস্ব বিচারকেই চূড়ান্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পর্ষদের বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন তোলারও কোন অবকাশ নেই। নাগরিকের উদ্যোগে মামলা হলে সে প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ সংস্থার সাহায্যের হাত বাড়ানোর আশা তাই দুরাশা মাত্র। ন্যায় বিচারের মূলনীতির পরিপন্থী এই অবস্থা। ... এসবের নীট ফল এই যে দূষণ রোধে বা তার

প্রতিকার চেয়ে নাগরিক উদ্যোগে মামলা প্রায় হয়নি বললেই চলে। দূষণকারী শিল্প/সংস্থা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দীর্ঘদিন ধরে কার্যত এসব উটকো ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে!

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের নতুন বিজ্ঞপ্তি জারী হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দূষণ-মামলা করতে চেয়ে নাগরিকদের আর পর্ষদ বা অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেবার দরকার নেই; 60 দিন অপেক্ষাও করতে হবে না। অভিযুক্ত সংস্থা বা ব্যক্তিকে জানিয়ে 30 দিনের মধ্যেই মামলা দায়ের করা যাবে।

কিন্তু এতেও অবস্থার ইতরবিশেষ হবার আশা কম, যদি না নথিপত্র এবং দুষিত জল-বাতাস-মাটির নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট ইত্যাদি সরবরাহ করে পর্ষদ নাগরিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, যদি না পর্ষদের নিজস্ব বা অনুমোদিত ল্যাবরেটারীর বাইরের কোন ল্যাবরেটারীর পরীক্ষার ফলও আদালতগ্রাহ্য বিবেচিত হয়।

মোটের উপর, তাই, একথা বলাই যায় যে দূষণ প্রতিরোধে বা দূষণকারীকে নিবৃত্ত করতে ব্যক্তি নাগরিকের আদালতে যাবার সুযোগ কার্যত নেই পরিবেশের প্রত্যক্ষ আইন কানুনে।

কিন্তু এই অবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে পরিবেশ ও দূষণের মামলাকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে আদালত গ্রহণ করায়। পরিবেশ আইন কানুনের যাবতীয় ঘাটতি-দুর্বলতা-জটিলতা এড়িয়ে এবং 'ভারপ্রাপ্ত দপ্তর ও সংস্থাদের নিষ্ক্রিয়তা উদাসীনতাকে ধাক্কা দিয়ে গঙ্গা-দূষণ মামলা সহ বেশ কিছু মামলা ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে সুফলও মিলেছে। সবচেয়ে বড় সুফল মিলেছে নাগরিক সচেতনতা ও উৎসাহ সঞ্চারে।

পরিবেশ আইনকানুন নাগরিকদের অভিযোগ জানাবার বা আদালতে যাবার যেটুকু অধিকার দিয়েছে তাও প্রায় দুরারোগ্যভাবে সমস্যা ও সর্তকন্টকিত। কিন্তু ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড, পুলিশ এ্যাক্ট বা ফিসরিজ অ্যাক্টের মত সাধারণ আইনে নাগরিকদের অভিযোগ জানাবার অধিকার প্রায় অবাধ (বিওবি এপ্রিল-জুন' 99 দ্রঃ)। পাবলিক ন্যুইস্যান্সের ঘটনা হিসেবে অনেক প্রকার দূষণের ব্যাপারে জেলা বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করা যায়। শব্দ দূষণের ব্যাপারেও এঁদের কাছে আবেদন করা যায়। কলকাতায় শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে নাগরিকরা পুলিশ কমিশনারের কাছেও অভিযোগ জানাতে পারেন। মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত কোন বহতা বা বদ্ধ জলাশয়ে কলকারখানার বর্জ্য বা ময়লা জল ফেললে বা ঐ জলাশয় ভরাট করার চেষ্টা হলে মৎস্যদপ্তরের বিধিবদ্ধ আধিকারিককে জানানো যায়। যে কোন নাগরিকের কাছ থেকে পাওয়া খবর ও তথ্য কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেবার আইনগত ক্ষমতা আছে ঐ সব ম্যাজিস্ট্রেট, অফিসার বা আধিকারিকের। যদিও তাঁদের ক্ষমতা সীমিত এবং তুলনীয় ক্ষেত্রে পরিবেশ আইনের মতো 'কঠোর' শাস্তি বা জরিমানার বিধানও এক্ষেত্রে প্রাযোজ্য নয়। পরিবেশ নিয়ে বিশেষ বিশেষ আইন চালু হবার ফলে সাধারণ আইনের এইসব সংস্থানগুলি (শব্দ-দূষণ বাদে) অব্যবহারে অকেজো হতে বসেছে। কিন্তু নাগরিকস্বার্থেই তা হওয়া উচিত নয়। বিশেষত যখন এভাবে অভিযোগ জানানো সহজ এবং নিষ্পত্তির জন্য সময় কম লাগার সম্ভাবনা।

পূর্বোক্ত ছড়ার লাইনটি বোধহয় এবার সম্পূর্ণ করে বলা যায় " টাক ডুমাডুম ডুম!"

রবীন মজুমদার

গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন

বাৎসরিক গ্রাহকদের গ্রাহকপদের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে গত ডিসেম্বর '*98* তে। অনেকের আটানববই-এর গ্রাহক চাঁদাও বাকি রয়েছে। অনুগ্রহ করে গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন। গ্রাহকচাঁদা কিছুটা বাড়াতে হলো। একান্ত নিরূপায় হয়েই। বাৎসরিক চাঁদা করা হয়েছে তিরিশ টাকা।

নর্মদা-আন্দোলন পরিচিতি

বর্ষা এক কালে নর্মদা উপত্যকা অঞ্চলের মানুষের কাছে কাঙ্খিত বিষয় ছিল। এখন হয়েছে আতঙ্কের। নর্মদা বাঁধ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে। প্রতি বছর নতুন নতুন এলাকা জলমগ্ন হচ্ছে। ডুবে যাচ্ছে গ্রাম। বাস্তুচ্যুত হচ্ছে শত শত মানুষ। উদাসীন সরকারী প্রশাসন। ঘর ছাড়তে নারাজ লোকজনকে ভাসতে হয় জলে। পাশে পান নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সাথীদের। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নর্মদা আন্দোলনের সত্যাগ্রহীরা জড়ো হয়েছিল মহারাষ্ট্রের জলসিন্ধিতে এবং মধ্যপ্রদেশের ডোমখেড়িতে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে কজন তাতে অংশ নিয়েছিলেন বর্তমান লেখক তাদের একজন। নর্মদা আন্দোলনের পূর্বাপর ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে এই লেখা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এর আগেও নর্মদা নিয়ে বিওবি'র একটি সংখ্যায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য জানুয়ারী-এপ্রিল 1990 সংখ্যা।

"মাথা তোলো তুমি বিন্ধ্যাচল....."

কি বানিয়া ইংরাজ শাসক, কি স্বাধীন ভারতের সেকুলার শাসক, নর্মদা নদী নিয়ে চিন্তাভাবনার দিক থেকে তাদের ফারাক খুঁজতে গেলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে।

1946 থেকে 1969 এই তেইশ বছরে যত ধরণের কমিশন, সমীক্ষা দল, বিশেষজ্ঞ দল তৈরী হলো তা গুণে শেষ করা মুশকিল। এর মধ্যে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র, এই দুই রাজ্যের জন্ম হলো ষাট সালে। আগে যে নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশ ও তৎকালীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতো, ষাট সালের পর তা তিনরাজ্যের (মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট) মধ্যে দিয়ে হচ্ছে।

1960 সালের আগস্ট মাসে ভারতের যোজনা কমিশন গুজরাটের কাছে নভাগ্রামে নর্মদা নদীর উপর একটি ছোট বাঁধ গড়বার ছাড়পত্র দেয়। আজকের বিশাল বহুমুখী, বিতর্কিত সর্দ্দার সরোবর প্রকল্পের সেই শুরু। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরু (ততদিনে তিনি বড় বড় বাঁধগুলোকে আধুনিক ভারতের মন্দির বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন) একষট্টি সালের এপ্রিল মাসে এই নভাগ্রাম বাঁধ প্রকল্পের শিলন্যাস করলেন(এর পেছনে গুজরাটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আজকের নর্মদার কমান্ড অঞ্চলে একক পরিবার হিসেবে সর্বোচ্চ জমির মালিক সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল-এর অবদান কতটা ছিলো তা অ্যাকাডেমিক গবেষণার বিষয় হতে পারে)। এই শিলান্যাসের জন্য শিশুপ্রিয়,গোলাপপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উড়ে আসার জন্য হেলিপ্যাড বানানো হয়। সর্দ্দার সরোবর প্রকল্পে সেই প্রথম উচ্ছেদের ইতিহাস সৃষ্টি হলো। বাঁধের কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক ইত্যাদির থাকার জন্য, জীপ গাড়ি যাবার জন্য এবং মন্ত্রীদের ঘন ঘন দ্রুত যাতায়াদের জন্য হেলিপ্যাড তৈরি হলো। এই জন্য ছ'টি গ্রাম অধিগ্রহণ করা হয়(চারটে পুরো, দু'টো আংশিক)। বলা বাহুল্য, এই গ্রামের কোনো অধিবাসীই সেই একষট্টি থেকে নিরানব্বই সালের এই সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছরেও পুনর্বাসন পাননি।

এরপর কিছুদিন উতোর-চাপান চলার পর, প্রথম জনতা মন্ত্রীসভার আমলে, গুজরাতি প্রধানমন্ত্রী মোরারজিভাই দেশাই-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে নর্মদা জলবিবাদ ট্রাইবুনালের রায়ে গুজরাটকে 9 MAF (মিলিয়ন একর ফুট) জল বন্টন করা হয়। এর পর থেকেই সর্দ্দার সরোবর প্রকল্প গড়গড় করে এগিয়ে চলে;আসতে থাকে বিশ্বব্যাঙ্কের দরাজ সাহায্য, পূর্বতন 'প্রভু' দেশ ইংরাজের ওভারসিজ ডেভেলপমেন্টের ঋণ, এশিয়ার 'বিশাল শক্তি' জাপানের ঋণ। অন্যদিকে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হয় বাঁধ বিরোধী আন্দোলনও।

"লড়াই করো, লড়াই করো যত দিন না বিজয়ী হও ....."

1986 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাষ্ট্র-এর উচ্ছেদ হওয়া মানুষরা এক জোট হয়ে 'নর্মদা ধরণগ্রস্থ সমিতি' গঠন করে। বছর খানেকের মধ্যেই (1987'র মে মাসে) বহু গান্ধীবাদী সংস্কারক মধ্যপ্রদেশে 'নর্মদা ঘাটী নবনির্মাণ সমিতি' গঠন করে। ওই বছরেরই জুন মাসে ভারতের পরিবেশ মন্ত্রক এই প্রকল্পকে শর্তাধীন ছাড়পত্র দেয়। শর্তাধীন এই কারণে যে এই প্রকল্প চালানর জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, নক্সা এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয় অসমাপ্ত থাকায় এই প্রকল্পকে কখনই পূর্ণ ছাড়পত্র দেওয়া যায়নি। গুজরাটে সর্দ্দার সরোবর এবং মধ্যপ্রদেশে বর্গি এবং অন্যান্য বাঁধ বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার ফলে দিন কে দিন উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সঙ্গে বাড়তে থাকে পুনর্বাসন-এর জন্য প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা। তিরিশে জানুয়ারী, 1988 তে গুজরাটের কেভড়িয়াতে তিন প্রদেশের প্রায় চার হাজার উচ্ছেদ হওয়া মানুষ প্রবল বিক্ষোভ দেখান। আঠেরই

আগষ্ট 1988 নর্মদা ধরণগ্রস্থ সমিতি (মহারাষ্ট্র), নর্মদা ঘাটী নবনির্মাণ সমিতি (মধ্যপ্রদেশ) এবং নর্মদা অসরগ্রস্থ সংঘর্ষ সমিতি (গুজরাট) বিভিন্ন তহশিল-দপ্তর গুলোতে একযোগে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এই সময় থেকেই বাঁধ তৈরীর বিরুদ্ধে জনমত গঠন হতে থাকে এবং পুনর্বাসন হওয়া যে সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে উচ্ছেদ হওয়া লোকজন সচেতন হতে থাকে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন প্রকাশ্যে তার বাঁধবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে এবং এই প্রকল্পের সার্বিক পুনর্বিবেচনার দাবি তোলে। ইতিমধ্যে বাঁধ বানানর বিভিন্ন কেলেঙ্কারী প্রচারিত হতে থাকে। সিএজি রিপোর্ট প্রকাশ্যে অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগ আনে। সুরাটের কেভড়িয়া অঞ্চল ক্রমশ বাঁধের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে গুজরাত সরকার ঐ অঞ্চলে নর্মদা প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় "অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট"-এর আওতায় বলে ঘোষণা করে আন্দোলন স্তব্ধ করার উদ্যোগ নেয়; কিন্তু প্রবল জনবিক্ষোভের মুখে পড়ে, সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

বাইশে ফেব্রুয়ারী 1989 তে যেখানে সর্দ্দার সরোবর বাঁধের কাজ চালু হয়েছে সেখানে দশ হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। এর পর ওই বছরেরই আঠাশে সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক হরশুদ র‍্যালী হয়; সারা দেশ থেকে কম করে পঞ্চাশ হাজার লোক ভারতের "বিনাশকারী বিকাশনীতি"-র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ছয়ই মার্চ, 1990 দশ হাজার ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন বোম্বে-আগ্রা জাতীয় সড়কে নর্মদা নদীর ওপর খালঘাট সেতু প্রায় আঠাশ ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বে বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অনশন কর্মসূচী চলতে থাকে। সাত-আট এপ্রিল, 1990 গুজরাটের আলিরাজপুর এবং মধ্যপ্রদেশের বড়ওয়ানীতে বিক্ষোভকারীদের ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে এবং লাঠি চালিয়ে দেওয়ার ফলে বহু মানুষ আহত হয়। সারা মে মাস (1990) জুড়েই আলিরাজপুরে সরকারী সমীক্ষক দলকে জমির জরিপ এবং সমীক্ষার কাজে বাধা দেওয়া হয়। দলে দলে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়; প্রতিটি ক্ষেত্রে লাঠি চালানয় বহু মানুষ আহত হয়। এই সময় থেকেই গুজরাত সরকার প্রচার করার চেষ্টা করে যে নর্মদা বাঁধ বিরোধী আন্দোলন আসলে গুজরাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই কোরাসে সাময়িকভাবে হলেও অনেক সৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও গলা মেলায়। আঠেরই এপ্রিল 1991 তে নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের অন্য বড় বাঁধ (মধ্যপ্রদেশের) নর্মদা সাগর, চিকল্‌দা, নিসারপুর অঞ্চলে বিক্ষোভ মিছিলের ওপর লাঠি চালানো হয়। এতদ্ সত্ত্বেও গুজরাতে সর্দ্দার সরোবর বাঁধের কাজ চলতেই থাকে এবং নর্মদার বুকে এক বড় সড় পাঁচিল গাঁথার কাজ অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে নর্মদার উজান অংশে, মধ্যপ্রদেশের নিমাড় অঞ্চলের বিখ্যাত বর্ষার আগমন ঘটে এবং নর্মদা নদীতে জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। সাধারণভাবে যে অতিরিক্ত জল প্রাকৃতিক নিয়মে উৎসমুখ থেকে মোহনা দিয়ে সাগরে মেশার কথা, তা মোহনার কাছে নর্মদার ওপর বাঁধে ধাক্কা খেয়ে, নর্মদার কূল ছাপিয়ে দুপারের গ্রামগুলোয় প্রবেশ করতে থাকে।

মহারাষ্ট্রে, নর্মদা বাঁধের কাছে এমনই এক অখ্যাত গ্রাম মনীবেলি—জনআন্দোলনের যোদ্ধাদের কাছে যেটা আজ অতি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। জুন মাসে বর্ষা আসার পর মনীবেলি গ্রামের অধিবাসীরা সিদ্ধান্ত নেয় জল যতই বাড়ুক না কেন তারা গ্রাম ছেড়ে নড়বে না। জুলাই 1991-তে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন মনীবেলিকে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। তেসরা আগস্ট টুলে জেলার পুলিশ মনীবেলি গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং তেষট্টি জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করে। তাদের 'অপরাধ' যে তারা নিজের নিজের বাড়ী আগলে বসে ছিলেন! এই সঙ্গে মহারাষ্ট্রের যে তেত্রিশটি গ্রাম বর্ষার সময় ডুবে যেতে পারে, সেইসমস্ত গ্রামে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সাতাশে সেপ্টেম্বর 1991 পুলিশের বিরুদ্ধে এক বিশাল বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এতদিন পরে হঠাৎ প্রশাসনের খেয়াল হয় যে গ্রামগুলোতে বিশেষত মনীবেলিতে উচ্ছেদের নোটিশই দেওয়া হয়নি। যদিও চুক্তি ছিলো যে গ্রামগুলো ডোবানর এক বছর আগেই, গ্রাম গুলোকে চিহ্নিত করে তাদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ করতে হবে। তিরিশে ডিসেম্বর, 1991 আঠাশটি পরিবার (এদের মধ্যে নারায়ণভাই তাড়ভী ছিলেন, যার কুঁড়ে প্রথমে ডোবে) তাদের পরভেটা পুনর্বাসন গ্রামের জমির পাট্টা সরকারকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। (পারভেটাতে চাষের জমি, পানীয় জল, বিদ্যালয় বা যাতায়াতের সুবিধে ছিলো না-তবে পনেরই আগষ্ট এবং ছাব্বিশে জানুয়ারী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য ডান্ডাটা পোঁতা ছিলো!)। 1992-এর এপ্রিল-এ সারা মনীবেলি গ্রাম ঘিরে ফেলা হয়। বুলডোজার সহযোগে একের পর এক কুঁড়ে ঘর মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। যারা তাদের ভিটে মাটি বাঁচানর জন্য রুখে দাঁড়ায় তাদের নির্মমভাবে ডান্ডাপেটা করা হয়।

ওই বছরই জুন মাসে বিশ্বব্যাঙ্কের নিরপেক্ষ পুনরীক্ষণ সমীক্ষার পরে মোর্স কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে বলা হয় যে এই প্রকল্পটি মৌলিক ভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং

এই সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাঙ্ক সর্দ্দার সরোবর প্রকল্প থেকে সাহায্য প্রত্যাহার করে নেয়।

কিন্তু মনীবেলিতে সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বর 1992 জুড়ে সত্যাগ্রহ এবং সন্ত্রাসও চলতে থাকে। মনীবেলি ছাড়াও ভাদগ্রামের ভুলাভাই-এর বাড়ী ডুবে যায়। জুলাই-এ মহারাষ্ট্রের পুনর্বাসন গ্রামের দানীভাই পাড়ভী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। বারোই ডিসেম্বর, গুজরাটের জামনগরে একটি সভায় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কর্মীদের প্রহার করা হয়।

1993 -এর আঠাশ থেকে তিরিশে জানুয়ারী, মহারাষ্ট্রের অঞ্জনওয়ারা গ্রামে নর্মদা নিগমের সমীক্ষক দলকে বাধা দেওয়া হয়। ঘোড়া ছুটিয়ে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রচুর লোক গ্রেফ্‌তারবরণ করে। গ্রেফতার হওয়া কর্মীদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটিয়ে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। 1993 -এর এপ্রিলে, গুজরাতের আন্ত্রাস গ্রামের (এই গ্রামটি জলে ডুবেছে বেশ কয়েকবার) বুধিবেনকে পুলিশ গণধর্ষণ করে। ইতিমধ্যে আবার বর্ষা চলে আসে এবং তত দিনে নর্মদার বুকে সর্দ্দার সরোবর বাঁধের পাঁচিল আরও উঁচু হয়ে গেছে। মে-জুনেতে মনীবেলিতে সত্যাগ্রহ চলতে থাকে। পুলিশ গ্রামের বাড়ী থেকে লোক বের করে দেয়। জুলাইতে মনীবেলি গ্রামের নিম্নাংশ ডুবে যায়-সঙ্গে জলের তলায় চলে যায় হাজার বছরের প্রাচীন শূরপনেশ্বর মন্দির।

উনিশে নভেম্বর 1993 মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে সমীক্ষা শুরু হয়ে যায়। চিঁচখেড়ি গ্রামে শান্তিপূর্ণ এক বিক্ষোভ মিছিলে ছেচল্লিশ রাউণ্ড গুলি চালানো হয়। পনের বছরের বালক রেহমল পুনিয়া ভাসাভা মৃত্যুবরণ করে। (এই বছর সেই গ্রামে রেহমল-এর স্মৃতিতে একটি জীবনশালা বিদ্যালয় উদ্বোধন হলো)।

20-21 মার্চ, 1994 নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বরোদা অফিসে বিজেপি বলে কথিত এক দল গুণ্ডা আক্রমণ চালায়। মনে হয় অফিস থেকে মূল্যবান কাগজ চুরি করা এবং কর্মীদের হুমকী দেওয়াই এই হামলার উদ্দেশ্য ছিলো।

1994 সালের সেপ্টম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের জলসিন্ধি এবং মধ্যপ্রদেশের ডোমখেড়ি গ্রাম জলমগ্ন হয়। সত্যাগ্রহ অব্যাহত থাকে। 1995 এর জানুয়ারীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থগিতাদেশের জন্য বাঁধের কাজ বন্ধ থাকে। তখন বাঁধের উচ্চতা ছিলো নব্বই মিটার।

কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট সরকার-এর পেশ করা হলফনামায় বিশ্বাস করে (যদিও সেই হলফনামাতেই দেখা যাচ্ছে যে সরকার বহু মিথ্যা তথ্য দিয়েছে) সুপ্রীম কোর্ট বাঁধের উচ্চতা আরও আট মিটার (পাঁচ মিটার বাঁধ এবং তিন মিটার একটা কুঁজ যেটা জলের ধাক্কা সামলানোর জন্য প্রয়োজন) বাড়ানর অনুমতি দেয়। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় গুজরাট সরকার এই আট মিটার বাঁধের কাজ শেষ করে। ফলে এই বছর বর্ষায় অন্য অনেক গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। 20 জুন 1999 থেকে আবার মধ্য প্রদেশের জলসিন্ধি এবং মহারাষ্ট্রের ডোমখেড়িতে সত্যাগ্রহ শুরু হয়।

দশই আগস্ট ডোমখেড়িতে জল ঢুকতে থাকে। এর আগের রাতে গুজরাটের হাপেশ্বর-এ জলের স্তর 98 মিটার ছাড়িয়ে যায়। এর প্রধান কারণ নিমাড় (মধ্যপ্রদেশ) অঞ্চলে অবিশ্রান্ত বর্ষণ এবং বর্গি বাঁধ থেকে তিরিশ হাজার কিউসেক, তাওয়া থেকে আঠাশ হাজার কিউসেক এবং বার্ণা থেকে তিরিশ হাজার কিউসেক প্রায় বারো ঘন্টা ধরে ছাড়া জল। রাজঘাট সেতুতে জলের উচ্চতা একশ সাতাশ মিটার হওয়ায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডোমখেড়ির সত্যাগ্রহ-কুঁড়ে ঘরে এগারই আগস্ট রাত দুটো নাগাদ জল প্রবেশ করে। ভোর ছটায় ঐ ঘরে যে সব সত্যাগ্রহী ছিলেন তাদের বুক সমান জল ওঠে। সকাল দশটায় পুলিশ আসে এবং বিকেল তিনটেয় সত্যাগ্রহীদের জোর করে ধড়গাঁও-এ নিয়ে যায় এবং পরের দিন তাদের মুক্তি দেয়। মুক্তির পর তারা আবার সত্যাগ্রহ স্থলে ফিরে আসে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় জলস্তর বিপদসীমার নীচে নেমে যায়। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টির ফলে বাঁধ থেকে জল ছেড়ে দিতে হয়। রাজঘাট সেতুতে 129 মিটার জল দেখার পর আবার যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আঠেরই সেপ্টেম্বর সকালে আবার ডোমখেড়ি, সিক্কা, জলসিন্ধি এবং সংলগ্ন গ্রামে ছয়ফুট জল দাঁড়িয়ে যায়। আবার পুলিশ এসে দু'শ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেফ্‌তার করে। মেধা পাটকার গ্রেফতার এড়িয়ে অন্যান্য জলমগ্ন গ্রামে সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছেন বলে আঠেরই সেপ্টেম্বর 1999 নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বরোদা দপ্তর থেকে জানা গেলো।

সুভাশিস মুখোপাধ্যায়

পরিক্রমা

চিকিৎসা ব্যবসা এই রাজ্যে

বিওবি'র দীর্ঘ দিনের পাঠক ছিলেন অধ্যাপক সুধেন্দু প্রসাদ বসু। মারা গেলেন গত বারোই মে। কলকাতার রুবি জেনারেল হাসপাতালে। হার্ট অপারেশনের সময়। অপারেশন টেবিলেই। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন দশ-ই মে। অর্থাৎ সাতই মে'তেও এসেছিলেন কলেজে। সকলে ঠাট্টা করেছে—এমন হেঁটে চলে বেড়ানো লোকের আবার অপারেশন!

এক মাস পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল 'অপারেশনের সাত দিন পর চুটিয়ে আড্ডা মারুন'। সাক্ষাৎকার দিয়েছেন রুবি হাসপাতালের হার্ট সার্জন ডাঃ বরদারাজন। তিনি বলেছেন শতকরা মাত্র একটি কি দুটি ক্ষেত্রে এই অপারেশন এখানে অসফল হয়। তবুও লোকে কেন যে অপারেশনের জন্য বোম্বাই-মাদ্রাজ ছোটেন তিনি বুঝতে পারেন না।

আমাদের সুধেন্দুদা দুর্ভাগ্যক্রমে 'শতকরা একটি কি দুটি' ক্ষেত্রের একজন হয়ে গেলেন। ডাঃ বরদারাজনের হাতেই। অপারেশনের আগে আমিও বলেছিলাম অপারেশন যদি করতেই হয় তো মাদ্রাজে গিয়ে করুন। মোটেও ভালে লাগে না এমন কথা বলতে অথবা শুনতে। তথাপি বলেছিলাম।

ঘনিষ্ঠ একজনের হার্ট অপারেশনের সময় সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম একবার ওই মাদ্রাজে। অসুবিধে বা ঠোক্কর খেতে হয়নি এমন নয়। তবুও অসহায় মনে হয়নি কখনও। যখনই কোন দ্বিধা জেগেছে মনে ছুটে গেছি ডাক্তারের কাছে। মন দিয়ে শুনেছেন কথা। ছুটে গিয়েছেন ওয়ার্ডে। রোগনীকে আশ্বস্ত করেছেন। আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করেছি। অপারেশানের পর ফিরে এসেছি কোন রকম ক্ষোভ ছাড়াই।

টাকা-পয়সার ব্যাপারেও একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে। যেটাতে অবাক না হয়ে পারিনি। এই রজ্যে এমন অভিজ্ঞতা কারো হয়েছে কিনা জানা নেই। আমার ওই আত্মীয়ার ওপেন হার্ট সার্জারির কথা ছিল। এখান থেকে সেই রকম পরামর্শ নিয়েই আমরা গিয়েছিলাম। ওখানাকার ডাক্তারেরা দেখেশুনে বেলুন এ্যান্‌জিওপ্লাস্টি করে একবার দেখবেন বললেন। তা'লে আর হার্ট ওপেন করতে হবে না, এই তাদের যুক্তি। চেষ্টা করলেন। সফল হল না। তারপর যথাতরীতি ওপেন হার্ট-ই হল। ফাইনাল রিসিপ্ট আনতে গিয়ে দেখলাম বেলুন এ্যানজিও'র টাকাটা ফেরৎ দিল। তাজ্জব আমরা। এও হয়?

সুধেন্দুদার অপারেশনের জন্য হাসপাতালের চার্জ ছিল আশি হাজার টাকা। তাছাড়া ডাক্তারের ফি তিরিশ হাজার। হাসপাতালের চার্জের ব্রেক-অপ ছিল অনেকটা এরকম ঃ বেড চার্জ, আই সি সি ইউ (তিন দিন), ওষুধ, টেষ্টিং, ডিসপোজেবলস্ ইত্যাদি। উনি দশ তারিখ ভর্তি হয়েছিলেন। মারা গেছেন বারো তারিখ। অপারেশন থিয়েটারেই। আই সি সি ইউ'র দোর গোড়াতেও যেতে হয়নি।

আশা করা গিয়েছিল হাসপাতাল চার্জের অনেকটাই ফেরৎ পাওয়া যাবে। পুরো টাকাটা ভর্তির আগেই দিয়ে দিতে হয়েছিল। ফাইনাল রিসিপ্ট আনতে গিয়ে জানা গেল টাকা ফেরৎ দেওয়ার কোন ব্যাপার নেই। কারণ ওটা প্যাকেজ ডিল;প্যাকেজে যা দেওয়া হবে পুরোটাই হাসপাতালের, ওগরানোর ব্যাপার নেই।

এই নিয়ে সামান্য চাপাচাপি করাতে ভেবে দেখার সময় চায়। দিন পনের পর জানানো হয়, কিছু করা যাচ্ছে না। এক মাস পর তারা মত বদলেছে। কয়েক হাজার টাকা ফেরৎ দিয়েছে। একটা কারণ এই হতে পারে যে রেফারিং ডাক্তার অধ্যাপক বসুর পরিবারের খুবই পরিচিতি এবং তিনিও এই হাসপাতালের সাথে কোন ভাবে যুক্ত।

ডাঃ বরদারাজন বুঝতে না পারারই কথা যে কেন লোকে কোলকাতা ছেড়ে এত ঝক্কি ঝামেলা পুইয়েও সুদূর বোম্বাই-মাদ্রাজ ছোটেন। এক সময় কিন্তু এই প্রবাহ ছিল কলকাতামুখী। রেপুটেশন গড়তে সময় লাগে। ভাঙতে একেবারেই নয়। বোম্বাই-মাদ্রাজের সকলেই ধোয়া তুলসীপাতা এমন মনে করার কারণ নেই। তবুও সামগ্রিকভাবে দেখলে বোঝা যায় মানুষের এই প্রবাহ ধরে রাখার জন্য একটা সচেতন প্রয়াস রয়েছে।

কিন্তু এখানে? হাসপাতালে গিয়ে কোন রকম বাজে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয়নি এমন লোকের দেখা পাওয়া শক্ত। বিশেষ করে নতুন গজিয়ে ওঠা গুলো থেকে। আসলে যারা এই উদ্যোগগুলোর পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তারা কোন শ্রেণী বা প্রকৃতির মানুষ সেটা খতিয়ে দেখার বিষয়। টাকার প্রকারভেদ না থাকলেও মানুষের তো আছেই। হয়তো এর অনেকেই আছেন যারা কলের জল বোতলে পুরে মিনারেল

ওয়াটার হিসেবে বিক্রি করার মত উপায়ে অর্থোপার্জন করে বড়লোক হয়েছেন। এরপর 'বড় কাজে' হাত দিয়েছেন। পিয়ারলেস হাসপাতালের মত 'জাঁদরেল' হাসপাতালেও 'ইন্‌ফ্লেটেড বিল' করা হয়। বললে চোখ রাঙানি যেতে হয়। তবে ঝানু খদ্দেরের পাল্লায় পড়লে অবশ্য তা সংশোধিতও হয়। এমন বিল যে আকছার করা হচ্ছে না কে বলতে পারে? আর করলে হাসপাতালের ডাক্তার বা কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করার 'ধৃষ্টতা' দেখাতে পারে এমন মাজার জোর কটি মানুষের আছে? হাসপাতাল নার্সিং হোমেরই আজকাল পোষা মাস্তান থাকে। ডাঃ বরদারাজন এসব জানেন না এমন মনে করার কারণ নেই। হাসপাতালের বা নার্সিং হোমগুলোর ব্যবস্থাদির কথা তুললাম না। এমন কি ডাঃ বরদারাজনের হাসপাতালের কথাও। সেখানে ডোনারদের ব্লাড-ম্যাচ করানোর ব্যবস্থা আছে কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু হার্ট অপারেশনের ব্যবস্থা রয়েছে! হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

হ্যাঁ, একটি পরামর্শ সবার জন্য। হাসপাতাল বা নার্সিংহোম থেকে আপনার প্রিয়জনকে ছাড়িয়ে আনার আনন্দে বিলগুলো দেখেশুনে নিতে ভুলবেন না। বিলে প্রতিটি আইটেমের আলাদা আলাদা মূল্য উল্লেখ থাকার কথা। কোন রকম প্যাথলজিকাল টেস্ট হয়ে থাকলে সেই টেস্ট রিপোর্টটা চেয়ে নিতে ভুলবেন না। কারচুপির সব থেকে বড় রাস্তা এইটি। এবং এর খরচের বহরই আজকাল সব থেকে বেশী। রিপোর্ট না দিতে পারলে তার চার্জটা বিল থেকে কেটে দিতে বলবেন। আর যদি সেটা না করতে রাজি হয় তো কাউন্টারের ভদ্রলোককে সেটা বিলের ওপর লিখে সই করে নার্সিং হোমের স্ট্যাম্প মেরে দিতে বলুন। এরপর এর জেরক্স কপি দিয়ে মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ দায়ের করুন। জবাব না পেলে রিমাইন্ডার দিন। জবাব পাবেন। এর পর জানতে চান কি ব্যবস্থা নেওয়া হল। আসলে ত্রুটি আমাদের নিজেদেরও আছে। যে সুযোগুলি আছে তা অব্যবহারে অকেজো হয়ে রয়েছে। একটু সক্রিয় হলে হয়তো তারাও কাজ পেয়ে নড়ে চড়ে বসতে পারে। ওদের ঠিকানা ঃ দি রেজিষ্ট্রার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল, 8 লায়ন্স রেঞ্জ, কলকাতা-700001.

□□

কার্গিল ও দেশপ্রেম

কার্গিলে যুদ্ধ হল। বহু জওয়ানের প্রাণ গেল। আবার কারো কারো কপাল খুললো। যুদ্ধ মানেই অস্ত্র। মানে ফের বোফর্স। তবে বোফর্সের কামান-ই নাকি কামাল করেছে এবার। তাই বোফর্স ফের ডার্লিং সবার। খুশি সমর দপ্তর। নড়ে উঠেছে মন্ত্রক। কিন্তু বোফর্সের সাথে তো আড়ি এখন! যুদ্ধের মাঝেই তাই খবর বেরোল ফের দোস্তি পাতানো হোক।

তবে যুদ্ধের সময় বন্ধুর অভাব হয় না। বিশেষ করে যুদ্ধ মানেই ব্যবসা যখন। অস্ত্র বাজারের দালালরা প্রস্তুত সর্বদা। সাড়া এলো সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। কোন এক কোম্পানী বলেছে—কুছ পরোয়া নেই। দাগো কামান। গোলা যত লাগে দেবো আমরা। গোলা প্রতি দাম পড়বে মাত্র চারশো ডলার! সেনা বিভাগের মুখপাত্র জানিয়েছেন—খুবই সস্তা অফার।

দিনে কত গোলা লেগেছে কার্গিল, বাটালিক, টেলোলিং ইত্যাদি ইত্যাদি গিরিশৃঙ্গে? জানা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইনি কখনও। গোলার হিসেব করা তাই সম্ভব নয়। তবে এক নির্ভীক সাংবাদিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জানাচ্ছেন একটি হিসেব। —সতেরই জুন। এক ব্যাটেলিয়ান জওয়ান নাকি দিনে এক হাজারের মত গোলা দাগছেন। কোনো একজন ক্যাপ্টেন জানিয়েছেন তার রেজিমেন্টের আঠেরোটি কামান থেকে চব্বিশ ঘন্টায় চার হাজার তিনশোটি গোলা টপ্‌কেছেন তারা। কি সাংঘাতিক! তাহলে মাস খানেকে কত গোলা উড়লো? মানে কত ডলার তথা টাকা? সাথে কাত হওয়া মিগ-হেলিকপ্টারের হিসেবগুলোও ধরতে হবে। বুড়ো খোকাদের ওই খেলনার দাম তো একটু বেশী। একশো কোটি টাকার নীচে নয় কোনটাই।

যুদ্ধের মত মহান কর্মকাণ্ডে টাকার হিসেব করতে নেই। এই হিসেব যারা করে তারা হয় বেয়াকুফ্ অথবা দেশের শত্রু। এমন কি পাকিস্তানের চর হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আর চর ধরা পড়ার যা হিড়িক পড়েছে তাতে এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা মোটেই নিরাপদ নয়। সেদিক দিয়ে তথাকথিত সমর বিশেষজ্ঞ যারা তারাই বুদ্ধিমান। দৈনিক কাগজে লিখে দু'পয়সা কামাচ্ছেন। এক যোগে আওয়াজ তুলেছেন প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কোন অপোস নয়। সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সরকার রাজি।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর খুশি। ফ্রান্স-আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র-যন্ত্রপাতির কারবারিরা খুশি। একজন খবর দিচ্ছেন রাশিয়ার প্রায় বন্ধ একটি অস্ত্র কারখানার মেশিনপত্তর ফের ঝাড়পোঁছ শুরু হয়ে গেছে। অন্য দিকে ওদের অনেকদিন বসে যাওয়া 'বিমানবাহী জাহাজটির"

হিল্লে হল এবার। আমাদের নৌবাহিনীর প্রধানেরা বহুদিন তদ্বির চালাচ্ছিলেন এইটি কেনার ব্যাপারে। কার্গিলের এক ধাক্কায় হিল্লে হতে চলেছে এই জাহাজ নামক ডাক্কের।— যার জন্য গুনতে হবে বিশ হাজার কোটি টাকা! না, অনেকের মত সেই অঙ্ক কষত বসবো না যে এই টাকায় কতশো হাসপাতাল হত, কত হাজার স্কুল হতো, কত লক্ষ গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যেতো। অথবা কত কোটি একবেলা-খেয়ে-থাকা ভারতবাসীর ক'দিনের আরেক বেলার অন্ন সংস্থান হতো।— এসব প্রশ্ন দেশপ্রেমিকরা তোলেন না। দেশপ্রেমিকেরা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর দোরগোড়ায় গিয়ে লাইন দেন-কার্গিল-ফাণ্ডে অর্থদান করতে। মিল-কলের মালিকেরা একেক জন দু'চার দশ দিনের নাইট ক্লাবের খর্চা অবলীলায় তুলে দেন প্রধান কিংবা মুখ্যের হাতে। অনেকে দেন এক দিনের বেতন। সব থেকে বড় দেশপ্রেমিকরা কড়কড়ে মাড় দেওয়া ধুতি-শাড়ি পরে জওয়ানদের শবাধারে মালা দেন ঘুরে ঘুরে। অপামর জনসাধারন এ নাটক দ্যাখেন হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলে টিভি নেটওয়ার্কের বদৌলতে।

মাঝখান থেকে বেঘোরে প্রাণ দিল বেচারা জওয়ানগুলো। তবে দুনিয়ার তাবৎ দেশের জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন এদেশের তরুণ ওযুবকদের দেশের জন্য আত্মত্যাগের আকুতি দেখে! সেনা বিভাগে লোক নেওয়া হবে এমন গুজব রটে গিয়েছিল কিছু কিছু শহরে। কাতারে কাতারে তরুণ যুবক গিয়ে ভীড় করেছিল সেনা শিবিরগুলোয়। আশা, যদি একটা চাকুরি জুটে যায় এই মওকায়। হাহতোস্মি!— কোথায় চাকুরি? মিলেছে পুলিশের গুলি। প্রাণ দিয়েছেন বেশ কয়েকজন। এদের শবাধার ঘিরে নেচে নেচে ঘোরবার লোক জোটেনি—বলাই বাহুল্য। শবাধার চুলোয় যাক হয়তো কোনো পুলিশ মর্গে 'লাস' হয়ে পচেছে মৃতদেহগুলো। তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের মানুষ-প্রেমিক হতেই হবে এমন কোনো দিব্যি তো নেই।

□□

ফালুন গং ও চীন সরকার

নানা ধরণের অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যান ধারণা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপ অতীতে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন ধরণের বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল চীন দেশে। কিছু উদাহরণ ঃ

1796 ঃ 'শ্বেতপদ্ম সমাজ'— এই নামে গড়ে উঠেছিল একটি গোষ্ঠী। চীনের কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এর প্রভাব। তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বিদ্রোহ করতে। চীনে তখন চিং বংশের রাজত্ব। বেশ বিপাকে পড়তে হয়েছিল তাদের।

1850-1865 ঃ হং জিউকুয়ান-এর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'তাইপিং হেভেনলি কিংডম'। এই মর্ত্যেই ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতো এরা। এরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ওপিয়াম যুদ্ধের কথা সবাই জানেন। লক্ষ লক্ষ তাইপিং-বাসী প্রাণ দিয়েছিল এতে। যারা ছিল 'হেভেনলি কিংডমের' অনুগামী। এই বিদ্রোহ-ই হয়েছিল চীনে রাজবংশীয় রাজত্বের অবসান পর্বের শুরু।

1950 ঃ 'ঐক্যের পথ' নামের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে গোপনে। কম্যুনিষ্ট পার্টি আঘাত হানে এদের ওপর। অভিযোগ এরা কম্যুনিষ্টদের বলতো 'শয়তান'। আর সাম্যবাদকে বলতো 'সর্বনাশের পথ'।

1997-98 ঃ গড়ে ওঠে খৃষ্ট ধর্ম প্রভাবিত গোষ্ঠী 'সুপ্রিম স্পিরিট'। সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার কথাও এরা বলে।

গত 22শে জুলাই চীনা সরকার জনপ্রিয় আধা ধর্মীয় সংগঠন ফালুন গং গোষ্ঠীকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন। লি হং হি 1992 সালে এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। ফালুন গং আমদের দেশের যোগের দর্শন ও ব্যায়ামের চীনা সংস্করণ কুই গং এবং তাই চি শারীর বিদ্যা ও বৌদ্ধ ধর্মের কিছু ধারার এক সংমিশ্রণ। এর সঙ্গে এরা যোগ করেছে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এদের নেতা লির মিষ্টিক্যাল ধারণা। চীনের বহু দল কুই গং সমর্থন ও ব্যাবহার করে তাদের পেশী ও মনের শক্তি বাড়াবার জন্য। এরা বিশ্বাস করে ধ্যান, প্রাণায়াম বা শ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে মানুষের রোগ নিরাময় হয়, মানুষ সুস্বাস্থ্য অর্জন করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করে। তাদের সদস্য ও সমর্থক সারা চীন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এবং এদের সমর্থক সংখ্যা নাকি শুধুমাত্র চীনেই সাত কোটি, যার মধ্যে শাসকদল চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির বহু সদস্যও আছেন।

সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে— 'ফালুন গং বে আইনী

কাজ কর্মের সংগে যুক্ত। এরা কুসংস্কারের প্রচারক। নানাধরণের ভোজবাজী প্রচারের মাধ্যমে এরা দেশের সামাজিক স্থিতাবস্থা নষ্ট করছে।' সব থেকে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করেছেন যে তাদের এই গোষ্ঠীর সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে। নয়তো তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। ফালুন গংকে বে-আইনী ঘোষণার পর থেকেই এই গোষ্ঠীর সদস্য ও সমর্থকদের উপর ধারাবাহিক অত্যাচার ও গণহারে গ্রেপ্তার শুরু হয়েছে। চীনের প্রতিটি শহরে এদের সদস্য ও সমর্থকদের উপর পুলিশী আক্রমন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে ফালুন গং গোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যাপকহারে জমায়েত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে এর প্রতিবাদ করছেন। তাদের দাবী তাদের নেতাদের মুক্তি দিতে হবে এবং সংগঠনকে আইনী স্বীকৃতি দিতে হবে। এদের এক একটি জমায়েতে দশ থেকে বিশ হাজার মানুষ অংশ নিচ্ছেন।

ফালুন গং সম্বন্ধে চীন সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়তো ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে থাকা কিছু ইঙ্গিত। উনবিংশ শতাব্দীতে এরকমই একটি আধা ধর্মীয় সংগঠন কুইং রাজবংশের পতনের কারণ হয়েছিল, বিশেষত তাইপিং এবং বক্সার বিদ্রোহে।

মিঃ লি হংহি বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন। গোষ্ঠী স্থাপনের ক'বছর পরে যখন চীন সরকারের নজরে আসে এই গোষ্ঠী তখনই মিঃ লি দেশত্যাগ করেন। বলা হয়ে থাকে যে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে যেসব ফালুন গং সমর্থক আছেন তাদের পরামর্শেই মিঃ লির দেশত্যাগ। মিঃ লির দেশত্যাগে চীনা সরকারের সমস্যা কমে নি, যদিও সে কথা তারা মানতে চান না। ফালুন গং এর হিসেব মত বিশ্বব্যাপী এদের সমর্থক সংখ্যা দশ কোটি। এদের সমর্থক দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানে ক্রমশ বাড়ছে। ইন্টারনেটে এদের অসংখ্য ওয়েবসাইটই তার একটি প্রমাণ। একদিকে চীনে এই গোষ্ঠীর উপর সন্ত্রাস যেমন বাড়ছে অন্যদিকে বিভিন্ন চীনা দূতাবাসের সামনে এদের জমায়েত ও বিক্ষোভ প্রদর্শনও বাড়ছে। 23শে জুলাইকে সানফ্রান্সিকোর কিছু মানুষজন 'মিঃ লি হং হি দিবস' বলে ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে চীনের সংবাদপত্র ও টিভিতে লাগাতার এমন প্রচার চালানো হচ্ছে যে মনে হবে এই লি হংহি একজন পুরো খুনী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী।

এবারকার এই ধরপাকড় এবং সন্ত্রাসের পিছনে প্রধান কারণ গত 23শে এপ্রিল সকালে সংগঠনের স্বীকৃতির দাবীতে দশহাজার ফালুন গং সদস্যের চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির সদর দপ্তরের সামনে আচমকা জমায়েত। স্বভাবতই চীনা সরকার খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন এতে। কারণ উননববই এর 'তিয়েন আনমেন স্কোয়ার'-এর মত , অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে চীনের পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়েছিলো। তার পরেও এমন সমাবেশ? অসহ্য হয়ে উঠেছে তাদের।

এই খবরের মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় হল এখানে পরস্পরের মুখোমুখি একদিকে সুসংগঠিত 'বিজ্ঞান ও যুক্তিমনস্ক' শাসকদল ও অন্যদিকে সংগঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠী। দু'তরফেই জনসমর্থন প্রচুর। চীনের মানুষের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব নেই বলেই আমরা জানি। তবে কোন্ শূন্যতা তাদের ঠেলে দিল গণহারে ফালুন গং-এ যোগ দিতে? কমিউনিষ্ট শাসিত রাশিয়ায় রক্ষণশীল চার্চের রমরমা, বামফ্রন্ট জমানায় বাবাজীদের বাড়বাড়ন্ত। এসব গুলো খেয়াল রাখলে একথা ভাবার সময় বোধ হয় এসে গেছে যে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অঢেল ভোগ্যপন্যের অভাবই মানুষের একমাত্র সমস্যা নয়। এছাড়াও কিছু চাহিদা মানুষের আছে। এ মাত্রাটিকে আমরা যত অস্বীকার করব তত আসর জাঁকিয়ে বসবে ফালুন গং, মৌলবাদী হিন্দু বা মুসলিম গোষ্ঠী বা যোগী বাবাদের আখড়া।

—ভাস্কর সেন

পুস্তক পরিচিতি

পরিবেশ সঙ্কটে বিপন্ন পাখি

[দীপক কুমার দাঁ, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, পৃঃ 101, 50.00 টাঃ]

বাংলায় লেখা পাখি বিষয়ক গুটিকয়েক বইয়ের তালিকায় এটি একটি মূল্যবান সংযোজন। লেখার অনেকটাই অভিজ্ঞতা-রসে সিক্ত, তথ্যনিষ্ঠ। উত্তর চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙার পাখিদের পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা বইটির সম্পদ। এখানেও যে পাখিদের জীবন নিরাপদ নয় তা লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ভাষা ঝরঝরে।

বিজ্ঞান ক্লাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উৎসাহী ব্যক্তিদের এ ধরণের স্থানীয় সমীক্ষায় উৎসাহিত করবার মত একটি দৃষ্টান্ত এই বই। আমাদের জীব-বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও সঠিক কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমীক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সচেতন লেখক ও দায়িত্বশীল প্রকাশকের এই যুগলবন্দীও অভিনন্দনযোগ্য।

এতদ্‌সত্ত্বেও কয়েকটি কথা উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে। গোবরডাঙায় দেখা পাখিদের তালিকার সঙ্গে ছবি বা অন্ততঃ আঁকা চিত্রও যদি দেওয়া যেতো তবে বইটির উৎকর্ষতা ও ব্যবহারিক মূল্য অনেক বেড়ে যেতো। কারণ, পক্ষী পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বই-এর ক্ষেত্রে ছবি/অঙ্কন থাকা অপরিহার্য গণ্য করা হয়।

প্রচ্ছদের ছবিটির চিত্র-বিন্যাস ও বর্ণ ব্যবহার একটু অন্যরকম করে আরো বেশী বিপন্নতার ইঙ্গিতবাহী করা যেতো। প্রচ্ছদের 'সঙ্কট' ও ভিতরে ব্যবহৃত 'সংকট'-এর মধ্যে বানান সাযুজ্য থাকা উচিত ছিল।

বিষয় বিন্যাসে পারম্পর্যের ব্যাপারে আর একটু মনোযোগী হলে উৎকর্ষতা বাড়তো। যেমন (এক) জলার পাখির বিপন্নতা ও ব্যাঙের রপ্তানী বাণিজ্য (পৃঃ 22 ও পৃঃ101) দুটির বিন্যাস একত্রে করা এবং (দুই) 'পাখিরবাসা' অধ্যায়টিতে বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বাসা তৈরীর বিপন্নতার কারণ গুলি [বড় গাছের দুষ্প্রাপ্যতা (পৃঃ 71), আন্তঃ প্রজাতির সংগ্রাম (পৃঃ 81 ও 83), কীটনাশকে খাদ্য পোকার লার্ভায় বিষক্রিয়া (পৃং 83) ইত্যাদি] কোথায় কতটা ক্রিয়াশীল তার হদিশ দিতে পারলে ভালো হতো।

মুদ্রণ প্রমাদ নাম মাত্র হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঠের ছন্দপতন ঘটায়(লেখকের কথা এবং পৃঃ 55 ও 61তে)।

প্রতিটি পাখির বৈজ্ঞানিক নাম থাকলে ভাল হতো। অতিরিক্ত হিসাবে ইংরাজী সাধারণ নামও রাখা যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে ইংরাজী সাধারণ নাম আছে, বৈজ্ঞানিক নাম নেই বা উল্টোটা। যেমন 'ফটিকজল' ও 'চাতক' (পৃঃ 27 ও 34)।

ছয়টি প্রয়োজনীয় তালিকা, বিশেষতঃ পাঁচটি আহৃত তালিকা বইয়ের শেষে সংযোজিত হলেই ভালো হতো মনে হয়।

অনুরাধা মজুমদার

কষ্ট ক্রোধ ও আমূলপরিবর্ত্তনকামী রাজনীতি

8 পৃষ্ঠার পর

(4) **"আবশ্যিকতার জমানা থেকে স্বাধীনতার জমানা"** ("From the realm of necessity to the realm of freedom ") : এটা একটা দার্শনিক উক্তি। "আবশ্যিকতা বনাম স্বাধীনতা"—(NECESSITY VS. FREEDOM) এটা মার্কস-এর অনেক আগে থেকেই প্রচলিত এক পুরোনো দার্শনিক বিতর্ক। সংক্ষেপে এই বিতর্কের বিষয় হল ঃ আমরা কি ইচ্ছে করলেই, যা খুশী করতে পারি? না কি সে স্বাধীনতা আমাদের নেই, জড় ও জীবজগতের মতই আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকেও কতকগুলি ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক বিধানের বাঁধাবাঁধির অর্থাৎ,'আবশ্যিকতা' ('necessity') বা বাধ্যবাধকতার মধ্যেই চলতে হয়? অন্য কথায় প্রকৃত অর্থে "স্বাধীন ইচ্ছা" (Free-Will) বলে কিছু আছে কি? এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদের সংক্ষিপ্ত জবাব এরকম ঃ "প্রাকৃতিক নিয়মাবলী থেকে মুক্ত থাকার স্বপ্নের মধ্যে স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতা রয়েছে সেই সব নিয়মকে জানার মধ্যে। .... কাজেই উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারা—এছাড়া ইচ্ছার স্বাধীনতার আর কোন অর্থ নেই। কোন নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষের সিদ্ধান্ত যত মুক্ত হবে, সেই সিদ্ধান্তের অন্তর্বস্তু ততই আবশ্যিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে" [ANTI DüHRING-ENGELS]"। এই সমস্যা সম্পর্কে আরও অনেক মতামত আছে। কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত নেই।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার প্রবন্ধ **আমূল পরিবর্ত্তনকামী রাজনীতি ও অহং**

1. লেখকের পদবী ঃ আছে : গটলিয়ের, হবে : গটলিয়েব
2. পৃ: 11, Compassion-এর প্রতিশব্দ ঃ আছে : সমবেদনা, হবে : সমব্যথীত্ব
3.

পৃ:	অনুচ্ছেদ	আছে	হবে
12	6,7	ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য	ব্যক্তিতন্ত্র
13	4	করে আমার পথে	করলে আমার পক্ষে
15	3	ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকেও	ব্যক্তিতান্ত্রিকতাকেও
16	3	সমবেদনা	সমব্যথীত্ব

VIJNAN O VIJNANKARMI Vol XXI No.3 JULY-AUGUST SEPT. 1999 Rn. No. 34929/79

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, পি 252, লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

Space Donated by

A well wisher

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি,
117 কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।